লোকসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোকসাহিত্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ
কলিকাতা

প্রকাশ ১৩১৪

পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৩৩৮

সংস্করণ পৌষ ১৩৪৫

পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৫২, আশ্বিন ১৩৫৯, শ্রাবণ ১৩৬২, মাঘ ১৩৬৮

ফাল্গুন ১৩৭০, অগ্রহায়ণ ১৩৭২, শ্রাবণ ১৩৭৮, আষাঢ় ১৩৯১

ফাল্গুন ১৩৯৯

প্রকাশক শ্রীসুধাংশুশেখর ঘোষ

বিশ্বভারতী। ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড। কলিকাতা ১৭

মুদ্রক শ্রীরামগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সার্ভিস প্রিণ্টার্স। ৫৫/৬৪ কালীচরণ ঘোষ রোড। কলিকাতা ৫০

ছেলেভুলানো ছড়া

বাংলা ভাষায় ছেলে ভুলাইবার জন্য যে-সকল মেয়েলি ছড়া প্রচলিত আছে, কিছুকাল হইতে আমি তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত ছিলাম। আমাদের ভাষা এবং সমাজের ইতিহাস-নির্ণয়ের পক্ষে সেই ছড়াগুলির বিশেষ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে যে একটি সহজ স্বাভাবিক কাব্যরস আছে সেইটিই আমার নিকট অধিকতর আদরণীয় বোধ হইয়াছিল।

আমার কাছে কোন্‌টা ভালো লাগে বা না লাগে সেই কথা বলিয়া সমালোচনার মুখবন্ধ করিতে ভয় হয়। কারণ, যাঁহারা সুনিপুণ সমালোচক এরূপ রচনাকে তাঁহারা অহমিকা বলিয়া অপরাধ লইয়া থাকেন।

তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এরূপ অহমিকা অহংকার নহে, পরন্তু তাহার বিপরীত। যাঁহারা উপযুক্ত সমালোচক তাঁহাদের নিকট একটা দাঁড়িপাল্লা আছে; তাঁহারা সাহিত্যের একটা বাঁধা ওজন এবং সেইসঙ্গে অনেকগুলি বাঁধি বোল বাহির করিয়াছেন; যে-কোনো রচনা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করা যায় নিঃসংকোচে তাহার পৃষ্ঠে উপযুক্ত নম্বর এবং ছাপ মারিয়া দিতে পারেন।

কিন্তু অক্ষমতা এবং অনভিজ্ঞতা -বশত সেই ওজনটি যাঁহারা পান নাই, সমালোচনস্থলে তাঁহাদিগকে একমাত্র নিজের অনুরাগ-বিরাগের উপর নির্ভর করিতে হয়। অতএব সেরূপ লোকের পক্ষে সাহিত্য সম্বন্ধে বেদবাক্য প্রচলিত করিতে যাওয়াই স্পর্ধার কথা। কোন্‌ লেখা ভালো অথবা মন্দ তাহা প্রচার না করিয়া কোন্‌ লেখা আমার ভালো লাগে বা মন্দ লাগে সেই কথা স্বীকার করাই তাঁহাদের উচিত।

যদি কেহ প্রশ্ন করেন, সে কথা কে শুনিতে চায়, আমি উত্তর করিব,

সাহিত্যে সেই কথা সকল মানুষ শুনিয়া আসিতেছে। সাহিত্যের সমালোচনাকেই সমালোচনা বলা হইয়া থাকে, কিন্তু অধিকাংশ সাহিত্যই প্রকৃতি ও মানবজীবনের সমালোচনা মাত্র। প্রকৃতি সম্বন্ধে, মনুষ্য সম্বন্ধে, ঘটনা সম্বন্ধে কবি যখন নিজের আনন্দ বিষাদ বিস্ময় প্রকাশ করেন এবং তাঁহার নিজের সেই মনোভাব কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা ও রচনাকৌশলে অন্যের মনে সঞ্চারিত করিয়া দিবার চেষ্টা করেন, তখন তাঁহাকে কেহ অপরাধী করে না। তখন পাঠকও অহমিকা-সহকারে কেবল এইটুকু দেখেন যে 'কবির কথা আমার মনের সহিত মিলিতেছে কি না'। কাব্য-সমালোচকও যদি যুক্তিতর্ক এবং শ্রেণীনির্ণয়ের দিক ছাড়িয়া দিয়া কাব্যপাঠ-জাত মনোভাব পাঠকগণকে উপহার দিতে উদ্যত হন তবে সেজন্য তাঁহাকে দোষী করা উচিত হয় না।

বিশেষত আজ আমি যে কথা স্বীকার করিতে বসিয়াছি তাহার মধ্যে আত্মকথার কিঞ্চিৎ অংশ থাকিতেই হইবে। ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে আমি যে রসাস্বাদ করি ছেলেবেলাকার স্মৃতি হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখা আমার পক্ষে অসম্ভব। সেই ছড়াগুলির মাধুর্য কতটা নিজের বাল্যস্মৃতি এবং কতটা সাহিত্যের চিরস্থায়ী আদর্শের উপর নির্ভর করিতেছে তাহা নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বিশ্লেষণশক্তি বর্তমান লেখকের নাই। এ কথা গোড়াতেই কবুল করা ভালো।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান' এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই। আমি আমার সেই মনের মুগ্ধ অবস্থা স্মরণ করিয়া না দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিব না ছড়ার মাধুর্য এবং উপযোগিতা কী। বুঝিতে পারিব না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ডকাব্য, এত তত্ত্বকথা এবং নীতিপ্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদ্‌ঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মৃত

হইতেছে, অথচ এই-সকল অসংগত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।

এই-সকল ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারো মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।

ভালো করিয়া দেখিতে গেলে শিশুর মতো পুরাতন আর-কিছুই নাই। দেশ কাল শিক্ষা প্রথা -অনুসারে বয়স্ক মানবের কত নূতন পরিবর্তন হইয়াছে, কিন্তু শিশু শত সহস্র বৎসর পূর্বে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে; সেই অপরিবর্তনীয় পুরাতন বারংবার মানবের ঘরে শিশুমূর্তি ধরিয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে, অথচ সর্বপ্রথম দিন সে যেমন নবীন, যেমন সুকুমার, যেমন মূঢ়, যেমন মধুর ছিল আজও ঠিক তেমনি আছে। এই নবীন চিরত্বের কারণ এই যে, শিশু প্রকৃতির সৃজন; কিন্তু বয়স্ক মানুষ বহুল পরিমাণে মানুষের নিজ-কৃত রচনা। তেমনি ছড়াগুলিও শিশু-সাহিত্য; তাহারা মানব-মনে আপনি জন্মিয়াছে।

আপনি জন্মিয়াছে এ কথা বলিবার একটু বিশেষ তাৎপর্য আছে। স্বভাবত আমাদের মনের মধ্যে বিশ্বজগতের প্রতিবিম্ব এবং প্রতিধ্বনি ছিন্নবিচ্ছিন্নভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করে এবং অকস্মাৎ প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে গিয়া উপনীত হয়। যেমন বাতাসের মধ্যে পথের ধূলি, পুষ্পের রেণু, অসংখ্য গন্ধ, বিচিত্র শব্দ, বিচ্ছিন্ন পল্লব, জলের শীকর, পৃথিবীর বাষ্প— এই আবর্তিত আলোড়িত জগতের বিচিত্র উৎক্ষিপ্ত উড্ডীন খণ্ডাংশ-সকল সর্বদাই নিরর্থকভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, আমাদের মনের মধ্যেও সেইরূপ। সেখানেও আমাদের নিত্যপ্রবাহিত চেতনার মধ্যে কত বর্ণ গন্ধ শব্দ, কত

কল্পনার বাষ্প, কত চিন্তার আভাস, কত ভাষার ছিন্ন খণ্ড, আমাদের ব্যবহার-জগতের কত শত পরিত্যক্ত বিস্মৃত বিচ্যুত পদার্থ-সকল অলক্ষিত অনাবশ্যকভাবে ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়ায়।

যখন আমরা সচেতনভাবে কোনো-একটা বিশেষ দিকে লক্ষ করিয়া চিন্তা করি তখন এই-সমস্ত গুঞ্জন থামিয়া যায়, এই-সমস্ত রেণুজাল উড়িয়া যায়, এই-সমস্ত ছায়াময়ী মরীচিকা মুহূর্তের মধ্যে অপসারিত হয়; আমাদের কল্পনা, আমাদের বুদ্ধি একটা বিশেষ ঐক্য অবলম্বন করিয়া একাগ্রভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে। আমাদের মন-নামক পদার্থটি এত অধিক প্রভুত্বশালী যে, সে যখন সজাগ হইয়া বাহির হইয়া আসে তখন তাহার প্রভাবে আমাদের অন্তর্জগতের এবং বহির্জগতের অধিকাংশই সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়— তাহারই শাসনে, তাহারই বিধানে, তাহারই কথায়, তাহারই অনুচরপরিচরে নিখিল সংসার আকীর্ণ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখো, আকাশে পাখির ডাক, পাতার মর্মর, জলের কল্লোল, লোকালয়ের মিশ্রিত ধ্বনি, ছোটো বড়ো কত সহস্র প্রকার কলশব্দ নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে— এবং আমাদের চতুর্দিকে কত কম্পন, কত আন্দোলন, কত গমন, কত আগমন, ছায়ালোকের কতই চঞ্চল লীলাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত আবর্তিত হইতেছে— অথচ তাহার মধ্যে কতই যৎসামান্য অংশ আমাদের গোচর হইয়া থাকে; তাহার প্রধান কারণ এই যে, ধীবরের ন্যায় আমাদের মন ঐক্যজাল ফেলিয়া একেবারে এক ক্ষেপে যতখানি ধরিতে পারে, সেইটুকু গ্রহণ করে, বাকি সমস্তই তাহাকে এড়াইয়া যায়। যে যখন দেখে তখন ভালো করিয়া শোনে না; যখন শোনে তখন ভালো করিয়া দেখে না, এবং সে যখন চিন্তা করে তখন ভালো করিয়া দেখেও না, শোনেও না। তাহার উদ্দেশ্যের পথ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক পদার্থকে সে অনেকটা পরিমাণে দূর করিয়া দিতে পারে। এই ক্ষমতাবলেই সে এই জগতের অসীম বৈচিত্র্যের মধ্যেও আপনার নিকটে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে পারিয়াছে। পুরাণে

পাঠ করা যায়, পুরাকালে কোনো কোনো মহাত্মা ইচ্ছামৃত্যু ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের মনের ইচ্ছান্ধতা ইচ্ছাবধিরতার শক্তি আছে ; এবং এই শক্তি তাহাকে প্রতি পদেই ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত জগতের অধিকাংশই তাহার চেতনার বহির্ভাগ দিয়া চলিয়া যায়। সে নিজে বিশেষ উদ্‌যোগী হইয়া যাহা গ্রহণ করে এবং নিজের আবশ্যক ও প্রকৃতি -অনুসারে গঠিত করিয়া লয় তাহাই সে উপলব্ধি করে। চতুর্দিকে, এমন-কি, মানসপ্রদেশেও যাহা ঘটিতেছে, যাহা উঠিতেছে, তাহার সে ভালোরূপ খোঁজ রাখে না।

সহজ অবস্থায় আমাদের মানসাকাশে স্বপ্নের মতো যে-সকল ছায়া এবং শব্দ যেন কোন্‌ অলক্ষ্য বায়ুপ্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো সংলগ্ন কখনো বিচ্ছিন্ন ভাবে বিচিত্র আকার ও বর্ণ-পরিবর্তন-পূর্বক ক্রমাগত মেঘরচনা করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা যদি কোনো অচেতন পটের উপর নিজের প্রতিবিম্বপ্রবাহ চিহ্নিত করিয়া যাইতে পারিত তবে তাহার সহিত আমাদের আলোচ্য এই ছড়াগুলির অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাইতাম। এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত-পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো। সেইজন্যই বলিয়াছিলাম, ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।

উদাহরণস্বরূপে এইখানে দুই-একটি ছড়া উদ্‌ধৃত করিবার পূর্বে পাঠকদের নিকট মার্জনা ভিক্ষা করি ; প্রথমত, এই ছড়াগুলির সঙ্গে চিরকাল যে স্নেহার্দ্র সরল মধুর কণ্ঠ ধ্বনিত হইয়া আসিয়াছে আমার মতো মর্যাদাভীরু গম্ভীরস্বভাব বয়স্ক পুরুষের লেখনী হইতে সে ধ্বনি কেমন করিয়া ক্ষরিত হইবে ? পাঠকগণ আপন গৃহ হইতে, আপন বাল্যস্মৃতি হইতে সেই সুধাস্নিগ্ধ স্বরটুকু মনে মনে সংগ্রহ করিয়া লইবেন। ইহার সহিত যে স্নেহটি, যে সংগীতটি, যে সন্ধ্যা-প্রদীপালোকিত সৌন্দর্যচ্ছবিটি চিরদিন একাত্মভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে সে

আমি কোন্ মোহমন্ত্রে পাঠকদের সামনে আনিয়া উপস্থিত করিব! ভরসা করি, এই ছড়াগুলির মধ্যেই সেই মোহমন্ত্রটি আছে।

দ্বিতীয়ত, আট-ঘাট-বাঁধা রীতিমত সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই-সমস্ত গৃহচারিণী অকৃতবেশা অসংস্কৃতা মেয়েলি ছড়াগুলিকে দাঁড় করাইয়া দিলে তাহাদের প্রতি কিছু অত্যাচার করা হয়—যেন আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে ঘরের বধূকে উপস্থিত করিয়া জেরা করা। কিন্তু উপায় নাই। আদালতের নিয়মে আদালতের কাজ হয়, প্রবন্ধের নিয়মানুসারে প্রবন্ধ রচনা করিতে হয়—নিষ্ঠুরতাটুকু অপরিহার্য।

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ি কাজিতলা দিয়ে॥
কাজিফুল কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত-ঝুমঝুম্ পা-ঝুমঝুম্ সীতারামের খেলা॥
নাচো তো সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় তো জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট॥
ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন কে॥
তার বোনকে বিয়ে করি ওড়ফুল দিয়ে॥
ওড়ফুল কুড়তে হয়ে গেল বেলা।
তার বোনকে বিয়ে করি ঠিক দুক্কুর বেলা॥

ইহার মধ্যে ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ নাই সে কথা নিতান্তই পক্ষপাতী সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইবে। কতকগুলি অসংলগ্ন ছবি নিতান্ত সামান্য প্রসঙ্গসূত্র অবলম্বন করিয়া উপস্থিত হইয়াছে। একটা এই দেখা

যাইতেছে কোনোপ্রকার বাছ-বিচার নাই। যেন কবিত্বের সিংহদ্বারে নিস্তব্ধ শারদ মধ্যাহ্নের মধুর উত্তাপে দ্বারবান বেটা দিব্য পা ছড়াইয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কথাগুলো ভাবগুলো কোনোপ্রকার পরিচয়-প্রদানের অপেক্ষা না রাখিয়া, কোনোরূপ উপলক্ষ অন্বেষণ না করিয়া, অনায়াসে তাহার পা ডিঙাইয়া, এমন-কি, মাঝে মাঝে লঘুকরস্পর্শে তাহার কান মলিয়া দিয়া, কল্পনার অভ্রভেদী মায়াপ্রাসাদে ইচ্ছাসুখে আনাগোনা করিতেছে; দ্বারবানটা যদি ঢুলিতে ঢুলিতে হঠাৎ একবার চমক খাইয়া জাগিয়া উঠিত তবে সেই মুহূর্তেই তাহারা কে কোথায় দৌড় দিত তাহার আর ঠিকানা পাওয়া যাইত না।

যমুনাবতী সরস্বতী যিনিই হউন, আগামী কল্য যে তাহার শুভবিবাহ সে কথার স্পষ্টই উল্লেখ দেখা যাইতেছে। অবশ্য, বিবাহের পর যথাকালে কাজি-তলা দিয়া যে তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ি যাইতে হইবে সে কথা আপাতত উত্থাপন না করিলেও চলিত; যাহা হউক তথাপি কথাটা নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। কিন্তু বিবাহের জন্য কোনোপ্রকার উদ্‌যোগ অথবা সেজন্য কাহারো তিলমাত্র ঔৎসুক্য আছে এমন কিছুই পরিচয় পাওয়া যায় না। ছড়ার রাজ্য তেমন রাজ্যই নহে। সেখানে সকল ব্যাপারই এমন অনায়াসে ঘটিতে পারে এবং এমন অনায়াসে না-ঘটিতেও পারে যে, কাহাকেও কোনো-কিছুর জন্যই কিছুমাত্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বা ব্যস্ত হইতে হয় না। অতএব আগামী কল্য শ্রীমতী যমুনাবতীর বিবাহের দিন স্থির হইলেও সে ঘটনাকে বিন্দুমাত্র প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। তবে সে কথাটা আদৌ কেন উত্থাপিত হইল তাহার জবাবদিহির জন্যও কেহ ব্যস্ত নহে। কাজিফুল যে কী ফুল আমি নগরবাসী তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা স্পষ্ট অনুমান করিতেছি যে যমুনাবতী-নামক কন্যাটির আসন্ন বিবাহের সহিত উক্ত পুষ্পসংগ্রহের কোনো যোগ নাই। এবং হঠাৎ মাঝখান হইতে সীতারাম কেন যে হাতের বলয় এবং পায়ের নূপুর ঝুম ঝুম করিয়া নৃত্য আরম্ভ করিয়া দিল আমরা তাহার বিন্দু-বিসর্গ কারণ

দেখাইতে পারিব না। আলোচালের প্রলোভন একটা মস্ত কারণ হইতে পারে, কিন্তু সেই কারণ আমাদিগকে সীতারামের আকস্মিক নৃত্য হইতে ভুলাইয়া হঠাৎ ত্রিপূর্ণির ঘাটে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেই ঘাটে দুটি মৎস্য ভাসিয়া উঠা কিছুই আশ্চর্য নহে বটে, কিন্তু বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুটি মৎস্যের মধ্যে একটি মৎস্য যে লোক লইয়া গেছে তাহার কোনোরূপ উদ্দেশ না পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রচয়িতা কী কারণে তাহারই ভগিনীকে বিবাহ করিবার জন্য হঠাৎ স্থিরসংকল্প হইয়া বসিলেন, অথচ প্রচলিত বিবাহের প্রথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ওড়ফুল সংগ্রহদ্বারাই শুভকর্মের আয়োজন যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন এবং যে লগ্নটি স্থির করিলেন তাহাও নূতন অথবা পুরাতন কোনো পঞ্জিকাকারের মতেই প্রশস্ত নহে।

এই তো কবিতার বাঁধুনি। আমাদের হাতে যদি রচনার ভার থাকিত তবে নিশ্চয় এমন কৌশলে প্লট বাঁধিতাম যাহাতে প্রথমোক্ত যমুনাবতীই গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদে সেই ত্রিপূর্ণির ঘাটের অনির্দিষ্ট ব্যক্তির অপরিজ্ঞাত ভগ্নীরূপে দাঁড়াইয়া যাইত এবং ঠিক মধ্যাহ্নকালে ওড়ফুলের মালা-বদল করিয়া যে গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিত তাহাতে সহৃদয় পাঠকমাত্রেই তৃপ্তিলাভ করিতেন।

কিন্তু বালকের প্রকৃতিতে মনের প্রতাপ অনেকটা ক্ষীণ। জগৎ-সংসার এবং তাহার নিজের কল্পনাগুলি তাহাকে বিচ্ছিন্নভাবে আঘাত করে; একটার পর আর-একটা আসিয়া উপস্থিত হয়। মনের বন্ধন তাহার পক্ষে পীড়াজনক। সুসংলগ্ন কার্যকারণসূত্র ধরিয়া জিনিসকে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা তাহার পক্ষে দুঃসাধ্য। বহির্জগতে সমুদ্রতীরে বসিয়া বালক বালির ঘর রচনা করে, মানস-জগতের সিন্ধুতীরেও সে আনন্দে বসিয়া বালির ঘর বাঁধিতে থাকে। বালিতে বালিতে জোড়া লাগে না, তাহা স্থায়ী হয় না— কিন্তু বালুকার মধ্যে এই যোজনশীলতার অভাব-বশতই বাল্যস্থাপত্যের পক্ষে তাহা সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণ। মুহূর্তের মধ্যেই মুঠা মুঠা করিয়া তাহাকে একটা উচ্চ আকারে

পরিণত করা যায়— মনোনীত না হইলে অনায়াসে তাহাকে সংশোধন করা সহজ এবং শ্রান্তি বোধ হইলেই তৎক্ষণাৎ পদাঘাতে তাহাকে সমভূমি করিয়া দিয়া লীলাময় সৃজনকর্তা লঘুহৃদয়ে বাড়ি ফিরিতে পারে। কিন্তু, যেখানে গাঁথিয়া গাঁথিয়া কাজ করা আবশ্যক সেখানে কর্তাকেও অবিলম্বে কাজের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না— সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে আসিয়াছে। আমাদের মতো সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এইজন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি-অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্তলোকে দেবতার জগৎলীলার অনুকরণ করে। এইজন্যই আমাদের শাস্ত্রে ঈশ্বরের কার্যের সহিত বালকের লীলার সর্বদা তুলনা দেওয়া হইয়া থাকে, উভয়ের মধ্যেই একটা ইচ্ছাময় আনন্দের সাদৃশ্য আছে।

পূর্বোদ্‌ধৃত ছড়াটিতে সংলগ্নতা নাই, কিন্তু ছবি আছে। কাজিতলা, ত্রিপূর্ণির ঘাট এবং ওড়বনের ঘটনাগুলি স্বপ্নের মতো অদ্ভুত, কিন্তু স্বপ্নের মতো সত্যবৎ।

স্বপ্নের মতো সত্য বলাতে পাঠকগণ আমার বুদ্ধির সজাগতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবেন না। অনেক দার্শনিক পণ্ডিত প্রত্যক্ষ জগৎটাকে স্বপ্ন বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু, সেই পণ্ডিত স্বপ্নকে উড়াইতে পারেন নাই। তিনি বলেন, প্রত্যক্ষ সত্য নাই— তবে কী আছে? না, স্বপ্ন আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, প্রবল যুক্তির দ্বারা সত্যকে অস্বীকার করা সহজ, কিন্তু স্বপ্নকে অস্বীকার করিবার জো নাই। কেবল সজাগ স্বপ্ন নহে, নিদ্রাগত স্বপ্ন সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি পণ্ডিতেরও সাধ্য নাই স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নকে অবিশ্বাস করেন। জাগ্রত অবস্থায় তাঁহারা সম্ভব সত্যকেও সন্দেহ করিতে ছাড়েন না, কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় তাঁহারা চরমতম অসম্ভবকে অসংশয়ে গ্রহণ করেন। অতএব বিশ্বাসজনকতা-নামক যে গুণটি সত্যের সর্বপ্রধান গুণ হওয়া উচিত সেটা যেমন স্বপ্নের আছে এমন আর কিছুরই নাই।

এতদ্দ্বারা পাঠক এই কথা বুঝিবেন যে প্রত্যক্ষ জগৎ আমাদের কাছে যতটা সত্য, ছড়ার স্বপ্নজগৎ নিত্যস্বপ্নদর্শী বালকের নিকট তদপেক্ষা অনেক অধিক সত্য। এইজন্য অনেক সময় সত্যকেও আমরা অসম্ভব বলিয়া ত্যাগ করি, এবং তাহারা অসম্ভবকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর নদী এল বান।
শিবু ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন এক কন্যে খান।
এক কন্যে না খেয়ে বাপের বাড়ি যান॥

এ বয়সে এই ছড়াটি শুনিবামাত্র বোধ করি প্রথমেই মনে হয় শিবু ঠাকুর যে তিনটি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন তন্মধ্যে মধ্যমা কন্যাটিই সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী। কিন্তু এক বয়স ছিল যখন এতাদৃশ চরিত্রবিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিল না। তখন এই চারটি ছত্র আমার বাল্যকালের মেঘদূতের মতো ছিল। আমার মানসপটে একটি ঘনমেঘান্ধকার বাদলার দিন এবং উত্তালতরঙ্গিত নদী মূর্তিমান হইয়া দেখা দিত। তাহার পর দেখিতে পাইতাম সেই নদীর প্রান্তে বালুর চরে গুটিদুয়েক পান্‌সি নৌকা বাঁধা আছে এবং শিবু ঠাকুরের নব-বিবাহিতা বধূগণ চড়ায় নামিয়া রাঁধাবাড়া করিতেছেন। সত্য কথা বলিতে কী, শিবু ঠাকুরের জীবনটিকে বড়ো সুখের জীবন মনে করিয়া চিত্ত কিছু ব্যাকুল হইত। এমন-কি, তৃতীয়া বধূঠাকুরানী মর্মান্তিক রাগ করিয়া দ্রুতচরণে বাপের বাড়ি-অভিমুখে চলিয়াছেন, সেই ছবিতেও আমার এই সুখচিত্রের কিছুমাত্র ব্যাঘাতসাধন করিতে পারেন নাই। এই নির্বোধ তখনো বুঝিতে পারিত না, ঐ একটিমাত্র ছত্রে হতভাগ্য শিবু ঠাকুরের জীবনে কী এক হৃদয়বিদারক শোকাবহ পরিণাম সূচিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, চরিত্রবিশ্লেষণ অপেক্ষা চিত্রবিরচনের দিকেই তখন মনের গতিটা ছিল। এখন

বুঝিতে পারিতেছি, হতবুদ্ধি শিবু ঠাকুর তদীয় কনিষ্ঠ জায়ার অকস্মাৎ পিতৃগৃহ-প্রয়াণ-দৃশ্যটিকে ঠিক মনোরম চিত্র হিসাবে দেখেন নাই।

এই শিবু ঠাকুর কি কস্মিন কালে কেহ ছিল এক-এক বার এ কথাও মনে উদয় হয়। হয়তো বা ছিল। হয়তো এই ছড়ার মধ্যে পুরাতন বিস্মৃত ইতিহাসের অতি ক্ষুদ্র এক ভগ্ন অংশ থাকিয়া গিয়াছে। আর-কোনো ছড়ায় হয়তো বা ইহার আর-এক টুকরা থাকিতে পারে।

> এ পার গঙ্গা, ও পার গঙ্গা, মধ্যিখানে চর।
> তারি মধ্যে বসে আছে শিব সদাগর॥
> শিব গেল শ্বশুরবাড়ি, বসতে দিল পিঁড়ে।
> জলপান করিতে দিল শালিধানের চিঁড়ে॥
> শালিধানের চিঁড়ে নয় রে, বিন্নিধানের খই।
> মোটা মোটা সবরি কলা, কাগমারে দই॥

ভাবে-গতিকে আমার সন্দেহ হইতেছে শিবু ঠাকুর এবং শিবু সদাগর লোকটি একই হইবেন। দাম্পত্য সম্বন্ধে উভয়েরই একটু বিশেষ শখ আছে এবং বোধ করি আহার সম্বন্ধেও অবহেলা নাই। উপরন্তু গঙ্গার মাঝখানটিতে যে স্থান-টুকু নির্বাচন করিয়া লওয়া হইয়াছে তাহাও নবপরিণীতের প্রথম প্রণয়যাপনের পক্ষে অতি উপযুক্ত স্থান।

এই স্থলে পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, প্রথমে অনবধানতাক্রমে শিবু সদাগরের জলপানের স্থলে শালিধানের চিঁড়ার উল্লেখ করা হইয়াছিল কিন্তু পরক্ষণেই সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে 'শালিধানের চিঁড়ে নয় রে, বিন্নি-ধানের খই'। যেন ঘটনার সত্য সম্বন্ধে তিলমাত্র স্খলন হইবার জো নাই। অথচ এই সংশোধনের দ্বারা বর্ণিত ফলাহারের খুব যে একটা ইতর-বিশেষ হইয়াছে, জামাই-আদর সম্বন্ধে শ্বশুরবাড়ির গৌরব খুব উজ্জ্বলতররূপে পরিস্ফুট

হইয়া উঠিয়াছে, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ির মর্যাদা অপেক্ষা সত্যের মর্যাদা রক্ষার প্রতি কবির অধিক লক্ষ দেখা যাইতেছে। তাও ঠিক বলিতে পারি না। বোধ করি ইহাও স্বপ্নের মতো। বোধ করি শালি-ধানের চিঁড়া দেখিতে দেখিতেই পরমুহূর্তে বিন্নিধানের খই হইয়া উঠিয়াছে। বোধ করি শিবু ঠাকুরও কখন এমনি করিয়া শিবু সদাগরে পরিণত হইয়াছে কেহ বলিতে পারে না।

শুনা যায়, মঙ্গল ও বৃহস্পতির কক্ষমধ্যে কতকগুলি টুকরা গ্রহ আছে। কেহ কেহ বলেন, একখানা আস্ত গ্রহ ভাঙিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে। এই ছড়া-গুলিকেও সেইরূপ টুকরা জগৎ বলিয়া আমার মনে হয়। অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই-সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।

অবশ্য, বালকের কল্পনা এই ঐতিহাসিক ঐক্য-রচনার জন্য উৎসুক নহে। তাহার নিকট সমস্তই বর্তমান এবং তাহার নিকট বর্তমানেরই গৌরব। সে কেবল প্রত্যক্ষ ছবি চাহে এবং সেই ছবিকে ভাবের অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা করিতে চাহে না।

নিম্নোদ্ধৃত ছড়াটিতে অসংলগ্ন ছবি যেন পাখির ঝাঁকের মতো উড়িয়া চলিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের এই স্বতন্ত্র দ্রুতগতিতে বালকের চিত্ত উপর্যুপরি নব নব আঘাত পাইয়া বিচলিত হইতে থাকে।

নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোঁটন রেখেছে।
বড়ো সাহেবের বিবিগুলি নাইতে এসেছে॥
দু পারে দুই রুই কাৎলা ভেসে উঠেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে॥

ও পারেতে দুটি মেয়ে নাইতে নেবেছে।
ঝুনু ঝুনু চুলগাছটি ঝাড়তে নেগেছে॥
কে রেখেছে কে রেখেছে, দাদা রেখেছে।
আজ দাদার ঢেলা ফেলা, কাল দাদার বে॥
দাদা যাবে কোন্‌খান্ দে। বকুলতলা দে॥
বকুলফুল কুড়তে কুড়তে পেয়ে গেলুম মালা।
রামধনুকে বাদ্দি বাজে সীতেনাথের খেলা॥
সীতেনাথ বলে রে ভাই চালকড়াই খাব।
চালকড়াই খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথা হোথা জল পাব চিৎপুরের মাঠ॥
চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্ চিক্ করে।
সোনা-মুখে রোদ নেগে রক্ত ফেটে পড়ে॥

ইহার মধ্যে কোনো ছবিই আমাদিগকে ধরিয়া রাখে না, আমরাও কোনো ছবিকে ধরিয়া রাখিতে পারি না। ঝোঁটনবিশিষ্ট নোটন পায়রাগুলি, বড়ো সাহেবের বিবিগণ, দুই পারে ভাসমান দুই রুই কাতলা, পরপারে স্নাননিরত দুই মেয়ে, দাদার বিবাহ, রামধনুকের বাদ্য-সহকারে সীতানাথের খেলা, এবং মধ্যাহ্নরৌদ্রে তপ্তবালুচিক্কণ মাঠের মধ্যে খরতাপক্লিষ্ট রক্তমুখচ্ছবি— এ-সমস্তই স্বপ্নের মতো। ও পারে যে দুইটি মেয়ে নাহিতে বসিয়াছে এবং দুই হাতের চুড়িতে চুড়িতে ঝুন ঝুন শব্দ করিয়া চুল ঝাড়িতেছে তাহারা ছবির হিসাবে প্রত্যক্ষ সত্য, কিন্তু প্রাসঙ্গিকতা হিসাবে অপরূপ স্বপ্ন।

এ কথাও পাঠকদের স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, স্বপ্ন রচনা করা বড়ো কঠিন। হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, যেমন-তেমন করিয়া লিখিলেই ছড়া লেখা যাইতে পারে। কিন্তু সেই যেমন-তেমন ভাবটি পাওয়া সহজ নহে। সংসারের সকল কার্যেই আমাদের এমনি অভ্যাস হইয়া গেছে যে, সহজ

ভাবের অপেক্ষা সচেষ্ট ভাবটাই আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। না ডাকিলেও ব্যস্তবাগীশ চেষ্টা সকল কাজের মধ্যে আপনি আসিয়া হাজির হয়। এবং সে যেখানেই হস্তক্ষেপ করে সেখানেই ভাব আপন লঘু মেঘাকার ত্যাগ করিয়া দানা বাঁধিয়া উঠে, তাহার আর বাতাসে উড়িবার ক্ষমতা থাকে না। এইজন্য ছড়া জিনিসটা যাহার পক্ষে সহজ তাহার পক্ষে নিরতিশয় সহজ, কিন্তু যাহার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন, তাহার পক্ষে একেবারেই অসাধ্য। যাহা সর্বাপেক্ষা সরল তাহা সর্বাপেক্ষা কঠিন; সহজের প্রধান লক্ষণই এই।

পাঠক বোধ করি ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া থাকিবেন, আমাদের প্রথমোদ্ধৃত ছড়াটির সহিত এই ছড়া কেমন করিয়া মিশিয়া গিয়াছে। যেমন মেঘে মেঘে স্বপ্নে স্বপ্নে মিলাইয়া যায় এই ছড়াগুলিও তেমনি পরস্পর জড়িত মিশ্রিত হইতে থাকে, সেজন্য কোনো কবি চুরির অভিযোগ করে না এবং কোনো সমালোচকও ভাববিপর্যয়ের দোষ দেন না। বাস্তবিকই এই ছড়াগুলি মানসিক মেঘরাজ্যের লীলা, সেখানে সীমা বা আকার বা অধিকার-নির্ণয় নাই। সেখানে পুলিস বা আইন-কানুনের কোনো সম্পর্ক দেখা যায় না। অন্যত্র হইতে প্রাপ্ত নিম্নের ছড়াটির প্রতি মনোযোগ করিয়া দেখুন।

ও পারে জস্তিগাছটি জস্তি বড়ো ফলে।
গো জস্তির মাথা খেয়ে প্রাণ কেমন করে॥
প্রাণ করে হাইটাই গলা হল কাঠ।
কতক্ষণে যাব রে ভাই হরগৌরীর মাঠ॥
হরগৌরীর মাঠে রে ভাই পাকা পাকা পান।
পান কিনলাম, চুন কিনলাম, ননদে ভাজে খেলাম।
একটি পান হারালে দাদাকে ব'লে দেলাম॥
দাদা দাদা ডাক ছাড়ি দাদা নাইকো বাড়ি।
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি সুবল আছে বাড়ি॥

আজ সুবলের অধিবাস কাল সুবলের বিয়ে।
সুবলকে নিয়ে যাব আমি দিগ্‌নগর দিয়ে॥
দিগ্‌নগরের মেয়েগুলি নাইতে বসেছে।
মোটা মোটা চুলগুলি গো পেতে বসেছে।
চিকন চিকন চুলগুলি ঝাড়তে নেগেছে॥
হাতে তাদের দেবশাঁখা মেঘ নেগেছে।
গলায় তাদের তক্তিমালা রক্ত ছুটেছে।
পরনে তাদের ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে॥
দুই দিকে দুই কাতলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটি নিলেন গুরুঠাকুর একটি নিলেন টিয়ে॥
টিয়ের মার বিয়ে।
নাল গামছা দিয়ে॥
অশথের পাতা ধনে।
গৌরী বেটি কনে॥
নকা বেটা বর।
ঢ্যাম্ কুড়্‌কুড়্ বাদ্দি বাজে, চড়কডাঙায় ঘর॥

এই-সকল ছড়ার মধ্য হইতে সত্য অন্বেষণ করিতে গেলে বিষম বিভ্রাটে পড়িতে হইবে। প্রথম ছড়ায় দেখিয়াছি আলোচাল খাইয়া সীতারাম-নামক নৃত্যপ্রিয় লুব্ধ বালকটিকে ত্রিপূর্ণির ঘাটে জল খাইতে যাইতে হইয়াছিল; দ্বিতীয় ছড়ায় দেখিতে পাই সীতানাথ চাল কড়াই খাইয়া জলের অন্বেষণে চিৎপুরের মাঠে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; কিন্তু তৃতীয় ছড়ায় দেখা যাইতেছে, সীতারামও নহে, সীতানাথও নহে, পরন্তু কোনো এক হতভাগিনী ভ্রাতৃজায়ার বিদ্বেষপরায়ণা ননদিনী অস্থিফল-ভক্ষণের পর তৃষাতুর হইয়া হরগৌরীর মাঠে পান খাইতে গিয়াছিল এবং পরে অসাবধানা ভ্রাতৃবধূর তুচ্ছ অপরাধটুকু দাদাকে

বলিয়া দিবার জন্য পাড়া তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল।

এই তো তিন ছড়ার মধ্যে অসংগতি। তার পর প্রত্যেক ছড়ার নিজের মধ্যেও ঘটনার ধারাবাহিকতা দেখা যায় না। বেশ বুঝা যায়, অধিকাংশ কথাই বানানো। কিন্তু ইহাও দেখিতে পাই, কথা বানাইতে গেলে লোকে প্রমাণের প্রাচুর্য-দ্বারা সেটাকে সত্যের অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তোলে, অথচ এ ক্ষেত্রে সে পক্ষে খেয়ালমাত্র নাই। ইহাদের কথা সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে; দুইয়ের বার। ঐ-যে ছড়ার এক জায়গায় সুবলের বিবাহের উল্লেখ আছে সেটা কিছু অসম্ভব ঘটনা নহে। কিন্তু সত্য বলিয়াও বোধ হয় না।

দাদা দাদা ডাক ছাড়ি, দাদা নাইকো বাড়ি।
সুবল সুবল ডাক ছাড়ি, সুবল আছে বাড়ি॥

যেমনি সুবলের নামটা মুখে আসিল অমনিই বাহির হইয়া গেল, 'আজ সুবলের অধিবাস, কাল সুবলের বিয়ে।' সে কথাটাও স্থায়ী হইল না, অনতিবিলম্বেই দিগ্‌নগরের দীর্ঘকেশা মেয়েদের কথা উঠিল। স্বপ্নেও ঠিক এইরূপ ঘটে। হয়তো শব্দসাদৃশ্য অথবা অন্য কোনো অলীক তুচ্ছ সম্বন্ধ অবলম্বন করিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে একটা হইতে আর-একটা কথা রচিত হইয়া উঠিতে থাকে। মুহূর্তকাল পূর্বে তাহাদের সম্ভাবনার কোনোই কারণ ছিল না, মুহূর্তকাল পরেও তাহারা সম্ভাবনার রাজ্য হইতে বিনা চেষ্টায় অপসৃত হইয়া যায়। সুবলের বিবাহকে যদি বা পাঠকগণ তৎকালীন ও তৎস্থানীয় কোনো সত্য ঘটনার আভাস বলিয়া জ্ঞান করেন তথাপি সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন 'নাল গামছা দিয়ে টিয়ের মার বিয়ে' কিছুতেই সাময়িক ইতিহাসের মধ্যে স্থান পাইতে পারে না। কারণ, বিধবাবিবাহ টিয়ে-জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকিলেও নাল গামছার ব্যবহার উক্ত সম্প্রদায়ের

মধ্যে কস্মিন কালে শুনা যায় নাই। কিন্তু যাহাদের কাছে ছন্দের তালে তালে সুমিষ্ট কণ্ঠে এই-সকল অসংলগ্ন অসম্ভব ঘটনা উপস্থিত করা হইয়া থাকে তাহারা বিশ্বাসও করে না, সন্দেহও করে না, তাহারা মনশ্চক্ষে স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষবৎ ছবি দেখিয়া যায়।

বালকেরা ছবিও অতিশয় সহজে স্বল্পায়োজনে দেখিতে পায়। ইহার কারণ পূর্বে একস্থলে বলিয়াছি, ইচ্ছাশক্তি সম্বন্ধে বালকের সহিত দেবতার একটা সাদৃশ্য দেখা যায়। বালক যত সহজে ইচ্ছামাত্রই সৃজন করিতে পারে আমরা তেমন পারি না। ভাবিয়া দেখো, একটা গ্রন্থিবাঁধা বস্ত্রখণ্ডকে মুণ্ডবিশিষ্ট মনুষ্য কল্পনা করিয়া তাহাকে আপনার সন্তানরূপে লালন করা সামান্য ব্যাপার নহে। আমাদের একটা মূর্তিকে মানুষ বলিয়া কল্পনা করিতে হইলে ঠিক সেটাকে মানুষের মতো গড়িতে হয়— যেখানে যতটুকু অনুকরণের ত্রুটি থাকে তাহাতেই আমাদের কল্পনার ব্যাঘাত করে। বহির্জগতের জড়-ভাবের শাসনে আমরা নিয়ন্ত্রিত; আমাদের চক্ষে যাহা পড়িতেছে আমরা কিছুতেই তাহাকে অন্যরূপে দেখিতে পারি না। কিন্তু শিশু চক্ষে যাহা দেখিতেছে তাহাকে উপলক্ষমাত্র করিয়া আপন মনের মতো জিনিস মনের মধ্যে গড়িয়া লইতে পারে, মনুষ্যমূর্তির সহিত বস্ত্রখণ্ডরচিত খেলনকের কোনো বৈসাদৃশ্য তাহার চক্ষে পড়ে না, সে আপনার ইচ্ছারচিত সৃষ্টিকেই সম্মুখে জাজ্বল্যমান করিয়া দেখে।

কিন্তু তথাপি ছড়ার এই-সকল অযত্নরচিত চিত্রগুলি কেবল যে বালকের সহজ সৃজন-শক্তি-দ্বারা সৃজিত হইয়া উঠে তাহা নহে; তাহার অনেক স্থানে রেখার এমন সুস্পষ্টতা আছে যে, তাহারা আমাদের সংশয়ী চক্ষেও অতি সংক্ষেপ বর্ণনায় ত্বরিত-চিত্র আনিয়া উপস্থিত করে।

এই ছবিগুলি একটি-রেখা একটি-কথার ছবি। দেশালাই যেমন এক আঁচড়ে দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠে বালকের চিত্তে তেমনি একটি কথার টানে একটি

সমগ্র চিত্র পলকের মধ্যে জাগাইয়া তুলিতে হয়। অংশ যোজনা করিয়া কিছু গড়িয়া তুলিলে চলিবে না।

চিৎপুরের মাঠেতে বালি চিক্‌চিক্ করে।

এই একটিমাত্র কথায় একটি বৃহৎ অনুর্বর মাঠ মধ্যাহ্নের রৌদ্রালোকে আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়া উদয় হয়।

পরনে তার ডুরে শাড়ি ঘুরে পড়েছে।

ডুরে শাড়ির ডোরা রেখাগুলি ঘূর্ণাজলের আবর্তধারার মতো তনু গাত্রযষ্টিকে যেমন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেষ্টন করিয়া ধরে তাহা ঐ এক ছত্রে এক মুহূর্তে চিত্রিত হইয়া উঠিয়াছে। আবার পাঠান্তরে আছে—

পরনে তার ডুরে কাপড় উড়ে পড়েছে।

সে ছবিটিও মন্দ নহে।

আয় ঘুম আয় ঘুম বাগ্‌দিপাড়া দিয়ে।
বাগ্‌দিদের ছেলে ঘুমোয় জাল মুড়ি দিয়ে॥

ঐ শেষ ছত্রে জাল মুড়ি দিয়া বাগ্‌দিদের ছেলেটা যেখানে-সেখানে পড়িয়া কিরূপ অকাতরে ঘুমাইতেছে সে ছবি পাঠকমাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অধিক কিছু নহে, ঐ জাল মুড়ি দেওয়ার কথা বিশেষ করিয়া বলাতেই বাগ্‌দি সন্তানের ঘুম বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ হইয়াছে।

আয় রে আয় ছেলের পাল মাছ ধরতে যাই।
মাছের কাঁটা পায়ে ফুটল দোলায় চেপে যাই।
দোলায় আছে ছ পণ কড়ি গুনতে গুনতে যাই॥
এ নদীর জলটুকু টলমল করে।
এ নদীর ধারে রে ভাই বালি ঝুর্‌ঝুর্ করে॥
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে রক্ত ফুটে পড়ে॥

দোলায় করিয়া ছয় পণ কড়ি গুনিতে গুনিতে যাওয়াকে যদি পাঠকেরা ছবির হিসাবে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করেন তথাপি শেষ তিন ছত্রকে তাঁহারা উপেক্ষা করিবেন না। নদীর জলটুকু টলমল করিতেছে এবং তীরের বালি ঝুর্‌ঝুর্‌ করিয়া খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে, বালুতটবর্তী নদীর এমন সংক্ষিপ্ত সরল অথচ সুস্পষ্ট ছবি আর কী হইতে পারে।

এ তো এক শ্রেণীর ছবি গেল। আর-এক শ্রেণীর ছবি আছে যাহা বর্ণনীয় বিষয় অবলম্বন করিয়া একটা সমগ্র ব্যাপার আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত করিয়া দেয়। হয়তো একটা তুচ্ছ বিষয়ের উল্লেখে সমস্ত বঙ্গগৃহ বঙ্গসমাজ জীবন্ত হইয়া উঠিয়া আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। সে-সমস্ত তুচ্ছ কথা বড়ো বড়ো সাহিত্যে তেমন সহজে তেমন অবাধে তেমন অসংকোচে প্রবেশ করিতে পারে না। এবং প্রবেশ করিলেও আপনিই তাহার রূপান্তর ও ভাবান্তর হইয়া যায়।

দাদা গো দাদা শহরে যাও।
তিন টাকা করে মাইনে পাও॥
দাদার গলায় তুলসীমালা।
বউ বরনে চন্দ্রকলা॥
হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি॥

দাদার বেতন অধিক নহে— কিন্তু, বোনটির মতে তাহাই প্রচুর। এই তিন টাকা বেতনের সচ্ছলতার উদাহরণ দিয়াই ভগ্নীটি অনুনয় করিতেছেন—

হেই দাদা তোমার পায়ে পড়ি।
বউ এনে দাও খেলা করি॥

চতুরা বালিকা নিজের এই স্বার্থ-উদ্ধারের জন্য দাদাকেও প্রলোভনের ছলে আভাস দিতে ছাড়ে নাই যে 'বউ বরনে চন্দ্রকলা'। যদিও ভগ্নীর খেলেনাটি

তিন টাকা বেতনের পক্ষে অনেক মহার্ঘ তথাপি নিশ্চয় বলিতে পারি তাহার কাতর অনুরোধ রক্ষা করিতে বিলম্ব হয় নাই, এবং সেটা কেবলমাত্র সৌভ্রাত্রবশত নহে।

উলু উলু মাদারের ফুল।
বর আসছে কত দূর॥
বর আসছে বাঘ্‌নাপাড়া।
বড়ো বউ গো রান্না চড়া॥
ছোটো বউ লো জলকে যা।
জলের মধ্যে ন্যাকাজোকা।
ফুল ফুটেছে চাকা চাকা॥
ফুলের বরণ কড়ি।
নটে শাকের বড়ি॥

জামাতৃসমাগমপ্রত্যাশিনী পল্লীরমণীগণের ঔৎসুক্য এবং আনন্দ-উৎসবের ছবি আপনি ফুটিয়াছে এবং সেই উপলক্ষে শেওড়াগাছের-বেড়া-দেওয়া পাড়াগাঁয়ের পথঘাট, বন, পুষ্করিণী, ঘটকক্ষ বধূ এবং শিথিলগুণ্ঠন ব্যস্তসমস্ত গৃহিণীগণ ইন্দ্রজালের মতো জাগিয়া উঠিয়াছে।

এমন প্রায় প্রত্যেক ছড়ার প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলাদেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়। কিন্তু সে-সমস্ত অধিক পরিমাণে উদ্‌ধৃত করিতে আশঙ্কা করি, কারণ, ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

ছবি যদি কিছু অদ্ভুত গোছের হয়, তাহাতে কোনো ক্ষতি নাই বরঞ্চ ভালোই। কারণ, নূতনত্বে চিত্তে আরো অধিক করিয়া আঘাত করে। ছেলের কাছে অদ্ভুত কিছু নাই; কারণ, তাহার নিকট অসম্ভব কিছু নাই। সে এখনো জগতে সম্ভাব্যতার শেষসীমাবর্তী প্রাচীরে গিয়া চারি দিক হইতে মাথা ঠুকিয়া ফিরিয়া আসে নাই। সে বলে, যদি কিছুই সম্ভব হয় তবে

সকলই সম্ভব। একটা জিনিস যদি অদ্ভুত না হয় তবে আর-একটা জিনিসই বা কেন অদ্ভুত হইবে? সে বলে, একমুণ্ডওয়ালা মানুষকে আমি কোনো প্রশ্ন না করিয়া বিশ্বাস করিয়া লইয়াছি; কারণ, সে আমার নিকটে প্রত্যক্ষ হইয়াছে। দুইমুণ্ডওয়ালা মানুষের সম্বন্ধেও আমি কোনো বিরুদ্ধ প্রশ্ন করিতে চাহি না; কারণ, আমি তো তাহাকে মনের মধ্যে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। আবার স্কন্ধকাটা মানুষও আমার পক্ষে সমান সত্য; কারণ, সে তো আমার অনুভবের অগম্য নহে। একটি গল্প আছে, কোনো লোক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিল, আজ পথে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া আসিলাম; বিবাদে একটি লোকের মুণ্ড কাটা পড়িল, তথাপি সে দশ পা চলিয়া গেল। সকলেই আশ্চর্য হইয়া কহিল, বল কী হে, দ—শ পা চলিয়া গেল! তাঁহাদের মধ্যে একটি স্ত্রীলোক ছিলেন; তিনি বলিলেন, দশ পা চলা কিছুই আশ্চর্য নহে, উহার সেই প্রথম পা চলাটাই আশ্চর্য।

সৃষ্টিরও সেইরূপ প্রথম পদক্ষেপটাই মহাশ্চর্য, কিছু যে হইয়াছে ইহাই প্রথম বিস্ময় এবং পরম বিস্ময়ের বিষয়; তাহার পরে আরো যে কিছু হইতে পারে তাহাতে আশ্চর্য কী! বালক সেই প্রথম আশ্চর্যটার প্রতি প্রথম দৃষ্টিপাত করিতেছে; সে চক্ষু মেলিবামাত্র দেখিতেছে অনেক জিনিস আছে, আরো অনেক জিনিস থাকাও তাহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। এইজন্য ছড়ার দেশে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে সীমানা-ঘটিত কোনো বিবাদ নাই।

আয় রে আয় টিয়ে,
নায়ে ভরা দিয়ে ॥
না নিয়ে গেল বোয়াল মাছে।
তা দেখে দেখে ভোঁদড় নাচে ॥
ওরে ভোঁদড়, ফিরে চা।
খোকার নাচন দেখে যা ॥

প্রথমত, টিয়েপাখি নৌকা চড়িয়া আসিতেছে এমন দৃশ্য কোনো বালক তাহার পিতার বয়সেও দেখে নাই; বালকের পিতার সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। কিন্তু সেই অপূর্বতাই তাহার প্রধান কৌতুক। বিশেষত, হঠাৎ যখন অগাধ জলের মধ্য হইতে একটা স্ফীতকায় বোয়াল মাছ উঠিয়া, বলা নাই কহা নাই, খামকা তাহার নৌকাখানা লইয়া চলিল, এবং ক্রুদ্ধ ও ব্যতিব্যস্ত টিয়া মাথার রোঁয়া ফুলাইয়া, পাখা ঝাপটাইয়া, অত্যুচ্চ চীৎকারে আপত্তি প্রকাশ করিতে থাকিল, তখন কৌতুক আরো বাড়িয়া উঠে। টিয়া বেচারার দুর্গতি এবং জলচর প্রাণীটার নিতান্ত অভদ্র ব্যবহার দেখিয়া অকস্মাৎ ভোঁদড়ের দুর্নিবার নৃত্যস্পৃহাও বড়ো চমৎকার। এবং সেই আনন্দনর্তনপর নিষ্ঠুর ভোঁদড়-টিকে নিজের নৃত্যবেগ সম্বরণপূর্বক খোকার নৃত্য দেখিবার জন্য ফিরিয়া চাহিতে অনুরোধ করার মধ্যেও বিস্তর রস আছে। যেমন মিষ্ট ছন্দ শুনিলেই তাহাকে গানে বাঁধিয়া গাহিতে ইচ্ছা করে তেমনি এই-সকল ভাষার চিত্র দেখিলেই ইহাদিগকে রেখার চিত্রে অনুবাদ করিয়া আঁকিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু হায়, এ-সকল চিত্রের রস নষ্ট না করিয়া ইহাদের বাল্য সরলতা, উজ্জ্বল নবীনতা, অসংশয়তা, অসম্ভবের সহজ সম্ভবতা রক্ষা করিয়া আঁকিতে পারে এমন চিত্রকর আমাদের দেশে কোথায় এবং বোধ করি সর্বত্রই দুর্লভ।

খোকা যাবে মাছ ধরতে ক্ষীরনদীর কূলে।
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে।
খোকা ব'লে পাখিটি কোন্ বিলে চরে।
খোকা ব'লে ডাক দিলে উড়ে এসে পড়ে॥

ক্ষীরনদীর কূলে মাছ ধরিতে গিয়া খোকা যে কী সংকটেই পড়িয়াছিল তাহা কি তুলি দিয়া না আঁকিলে মনের ক্ষোভ মেটে? অবশ্য, ক্ষীরনদীর ভূগোলবৃত্তান্ত খোকাবাবু আমাদের অপেক্ষা অনেক ভালো জানেন সন্দেহ নাই; কিন্তু যে নদীতেই হউক, তিনি যে প্রাজ্ঞোচিত ধৈর্যাবলম্বন করিয়া পরম

গম্ভীরভাবে নিজ আয়তনের চতুর্গুণ দীর্ঘ এক ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরিতে বসিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট কৌতুকাবহ, তাহার উপর যখন জল হইতে ড্যাবা চক্ষু মেলিয়া একটা অত্যন্ত উৎকট গোছের কোলা ব্যাঙ খোকার ছিপ লইয়া টান মারিয়াছে এবং অন্য দিকে ডাঙা হইতে চিল আসিয়া মাছ ছোঁ মারিয়া লইয়া চলিয়াছে, তখন তাঁহার বিব্রত বিস্মিত ব্যাকুল মুখের ভাব—একবার বা প্রাণপণ শক্তিতে পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িয়া ছিপ লইয়া টানাটানি, একবার বা সেই উড্ডীন চৌরের উদ্দেশে তুই উৎসুক ব্যগ্র হস্ত ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপ—এ-সমস্ত চিত্র সুনিপুণ সহৃদয় চিত্রকরের প্রত্যাশায় বহুকাল হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে।

আবার খোকার পক্ষীমূর্তিও চিত্রের বিষয় বটে। মস্ত একটা বিল চোখে পড়িতেছে। তাহার ও পারটা ভালো দেখা যায় না। এ পারে তীরের কাছে একটা কোণের মতো জায়গায় বড়ো বড়ো ঘাস, বেতের ঝাড় এবং ঘন কচুর সমাবেশ; জলে শৈবাল এবং নালফুলের বন, তাহারই মধ্যে লম্বচঞ্চু দীর্ঘপদ গম্ভীরপ্রকৃতি ধ্যানপরায়ণ গোটাকতক বক-সারসের সহিত মিশিয়া খোকাবাবু ডানা গুটাইয়া নতশিরে অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে চরিয়া বেড়াইতেছেন, এ দৃশ্যটিও বেশ—এবং বিলের অনতিদূরে ভাদ্রমাসের জলমগ্ন পক্কশীর্ষ ধান্যক্ষেত্রের সংলগ্ন একটি কুটির; সেই কুটির-প্রাঙ্গণে বাঁশের বেড়ার উপরে বাম হস্ত রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত বিলের অভিমুখে সম্পূর্ণ প্রসারিত করিয়া দিয়া অপরাহ্নের অবসান-সূর্যালোকে জননী তাঁহার খোকাবাবুকে ডাকিতেছেন; বেড়ার নিকটে ঘরে-ফেরা বাঁধা গরুটিও স্তিমিত কৌতূহলে সেই দিকে চাহিয়া দেখিতেছে এবং ভোজনতৃপ্ত খোকাবাবু নালবন শৈবালবনের মাঝখানে হঠাৎ মায়ের ডাক শুনিয়া সচকিতে কুটিরের দিকে চাহিয়া উড়ি-উড়ি করিতেছে, সেও সুন্দর দৃশ্য—এবং তাহার পর তৃতীয় দৃশ্যে পাখিটি মার বুকে গিয়া তাঁহার কাঁধে মুখ লুটাইয়াছে এবং তুই ডানায় তাঁহাকে অনেকটা ঝাঁপিয়া ফেলিয়াছে এবং

নিমীলিতনেত্রে মা দুই হস্তে সুকোমল ডানা-সুদ্ধ তাহাকে বেষ্টন করিয়া নিবিড় স্নেহবন্ধনে বুকে বাঁধিয়া ধরিয়াছেন, সেও সুন্দর দেখিতে হয়।

জ্যোতির্বিদ্‌গণ ছায়াপথের নীহারিকা পর্যবেক্ষণ করিতে করিতে দেখিতে পান, সেই জ্যোতির্ময় বাষ্পরাশির মধ্যে মধ্যে এক-এক জায়গায় যেন বাষ্প সংহত হইয়া নক্ষত্রে পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে। আমাদের এই ছড়ার নীহারিকারাশির মধ্যেও সহসা স্থানে স্থানে সেইরূপ অর্ধসংহত আকারবদ্ধ কবিত্বের মূর্তি দৃষ্টিপথে পড়ে। সেই-সকল নবীনসৃষ্ট কল্পনামণ্ডলের মধ্যে জটিলতা কিছু নাই— প্রথম বয়সের শিশু-পৃথিবীর ন্যায় এখনো সে কিঞ্চিৎ তরলাবস্থায় আছে ; কঠিন হইয়া উঠে নাই। একটা উদ্‌ধৃত করি—

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
কাক কালো, কোকিল কালো, কালো ফিঙের বেশ।
তাহার অধিক কালো, কন্যে, তোমার মাথার কেশ॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
বক ধলো, বস্ত্র ধলো, ধলো রাজহংস।
তাহার অধিক ধলো, কন্যে, তোমার হাতের শঙ্খ॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার রাঙা দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
জবা রাঙা, করবী রাঙা, রাঙা কুসুমফুল।
তাহার অধিক রাঙা, কন্যে, তোমার মাথার সিঁদুর॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার তিতো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
নিম তিতো, নিসুন্দে তিতো, তিতো মাকাল ফল।
তাহার অধিক তিতো, কন্যে, বোন-সতিনের ঘর॥

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।
চার হিম দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ॥
হিম জল, হিম স্থল, হিম শীতলপাটি।
তাহার অধিক হিম, কন্যে, তোমার বুকের ছাতি॥

কবিসম্প্রদায় কবিত্বসৃষ্টির আরম্ভকাল হইতে বিবিধ ভাষায় বিচিত্র ছন্দে নারীজাতির স্তবগান করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু উপরি-উদ্‌ধৃত স্তব-গানের মধ্যে যেমন একটি সরল সহজ ভাব এবং একটি সরল সহজ চিত্র আছে এমন অতি অল্প কাব্যেই পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অজ্ঞাতসারে একটুখানি সরল কৌতুক আছে। সীতার ধনুক-ভাঙা এবং দ্রৌপদীর লক্ষ্যবেধ পণ খুব কঠিন পণ ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সরলা কন্যাটি যে পণ করিয়া বসিয়াছে সেটি তেমন কঠিন বলিয়া বোধ হয় না। পৃথিবীতে এত কালো ধলো রাঙা মিষ্টি আছে যে তাহার মধ্যে কেবল চারিটি মাত্র নমুনা দেখাইয়া এমন কন্যা লাভ করা ভাগ্যবানের কাজ। আজকাল কলির শেষ দশায় সমস্ত পুরুষের ভাগ্য ফিরিয়াছে, ধনুর্ভঙ্গ লক্ষ্যবেধ বিচারে -জয় এ-সমস্ত কিছুরই আবশ্যক হয় না; উলটিয়া তাঁহারাই কোম্পানির কাগজ পণ করিয়া বসেন, এবং সেই কাপুরুষোচিত নীচতার জন্য তিলমাত্র আত্মগ্লানি অনুভব করেন না। ইহা অপেক্ষা আমাদের আলোচিত ছড়াটির নায়ক-মহাশয়কে যে সামান্য সহজ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কন্যা লাভ করিতে হইয়াছিল সেও অনেক ভালো। যদিও পরীক্ষার শেষ ফল

উক্ত ছড়াটির মধ্যে পাওয়া যায় নাই তথাপি অনুমানে বলিতে পারি লোকটি পুরা নম্বর পাইয়াছিল। কারণ, দেখা যাইতেছে, প্রত্যেক শ্লোকের চারিটি উত্তরের মধ্যে চতুর্থ উত্তরটি দিব্য সন্তোষজনক হইয়াছিল। কিন্তু, পরীক্ষয়িত্রী যখন স্বয়ং সশরীরে সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন তখন সে উত্তরগুলি জোগানো আমাদের নায়কের পক্ষে যে কিছুমাত্র কঠিন হইয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না; ও যেন ঠিক বই খুলিয়া উত্তর দেওয়ার মতো। কিন্তু, সেজন্য নিষ্ফল ঈর্ষা প্রকাশ করিতে চাহি না। যিনি পরীক্ষক ছিলেন তিনি যদি সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন তবে আমাদের আর-কিছু বলিবার নাই।

প্রথম ছত্রে কন্যা কহিতেছেন—

জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ।

ইহা হইতে বোধ হইতেছে, পরীক্ষা আরো পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছে এবং পরীক্ষার্থী এমন মনের মতন আনন্দজনক উত্তরটি দিয়াছে যে, কন্যার প্রশ্নজিজ্ঞাসার ইচ্ছা উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে। বাস্তবিক এমন রঙ্গ আর-কিছু নাই।

যাহা হউক, আমাদের উপরে এই ছড়াটির রচনার ভার থাকিলে খুব সম্ভব ভূমিকাটা রীতিমত ফাঁদিয়া বসিতাম; এমন আচমকা মাঝখানে আরম্ভ করিতাম না। প্রথমে একটা পরীক্ষাশালার বর্ণনা করিতাম, সেটা যদি-বা ঠিক সেনেট হলের মতো না হইত, অনেকটা ইড্‌ন্ গার্ডেনের অনুরূপ হইতে পারিত। এবং তাহার সহিত জ্যোৎস্নার আলো, দক্ষিণের বাতাস এবং কোকিলের কুহুধ্বনি যোগ করিয়া ব্যাপারটাকে বেশ একটু জমজমাট করিয়া তুলিতাম—আয়োজন অনেকরকম করিতে পারিতাম, কিন্তু এই সরল সুন্দর কন্যাটি যাহার মাথার কেশ ফিঙের অপেক্ষা কালো, হাতের শাঁখা রাজহংসের অপেক্ষা ধলো, সিঁথার সিঁদুর কুসুমফুলের অপেক্ষা রাঙা, স্নেহের কোল ছেলেদের কথার অপেক্ষা মিষ্ট এবং বক্ষস্থল শীতল জলের

অপেক্ষা স্নিগ্ধ, সেই মেয়েটি—যে মেয়ে সামান্য কয়েকটি স্তুতিবাক্য শুনিয়া সহজ বিশ্বাসে ও সরল আনন্দে আত্মবিসর্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে—তাহাকে আমাদের সেই বর্ণনাবহুল মার্জিত ছন্দের বন্ধনের মধ্যে এমন করিয়া চিরকালের মতো ধরিয়া রাখিতে পারিতাম না।

কেবল এই ছড়াটি কেন, আমাদের উপর ভার দিলে আমরা অধিকাংশ ছড়াই সম্পূর্ণ সংশোধন করিয়া নূতন সংস্করণের যোগ্য করিয়া তুলিতে পারি। এমন-কি, উহাদের মধ্যে সর্বজনবিদিত নীতি এবং সর্বজনদুর্বোধ্য তত্ত্বজ্ঞানেরও বাসা নির্মাণ করিতে পারি। কিছু না হউক, উহাদিগকে আমাদের বর্তমান শিক্ষা ও সামাজিক অবস্থার উন্নততর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করিয়া দিতে পারি। বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমরা যদি কখনো বর্তমান সভ্যসমাজে চাঁদকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে ইচ্ছা করি তবে কি তাঁহাকে নিম্নলিখিতরূপে তুচ্ছ প্রলোভন দেখাইতে পারি—

আয় আয় চাঁদামামা টী দিয়ে যা।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গোরুর দুধ দেব,
দুধ খাবার বাটি দেব,
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা॥

এ কোন্ চাঁদ! নিতান্তই বাঙালির ঘরের চাঁদ। এ আমাদের বাল্য-সমাজের সর্বজ্যেষ্ঠ সাধারণ মাতুল চাঁদা। এ আমাদের গ্রামের কুটিরের নিকটে বায়ু-আন্দোলিত বাঁশবনের রন্ধ্রগুলির ভিতর দিয়া পরিচিত স্নেহ-হাস্যমুখে প্রাঙ্গণধূলিবিলুণ্ঠিত উলঙ্গ শিশুর খেলা দেখিয়া থাকে; ইহার

সঙ্গে আমাদের গ্রামসম্পর্ক আছে। নতুবা, এতবড়ো লোকটা যিনি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রসুন্দরীর অন্তঃপুরে বর্ষ যাপন করিয়া থাকেন, যিনি সমস্ত সুরলোকের সুধারস আপনার অক্ষয় রৌপ্যপাত্রে রাত্রিদিন রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, সেই শশলাঞ্ছন হিমাংশুমালীকে মাছের মুড়ো, ধানের কুঁড়ো, *কালো গোরুর দুধ খাবার বাটির প্রলোভন দেখাইতে* কে সাহস করিত! আমরা হইলে বোধ করি পারিজাতের মধু, রজনীগন্ধার সৌরভ, বউ-কথা-কও'এর গান, মিলনের হাসি, হৃদয়ের আশা, নয়নের স্বপ্ন, নববধূর লজ্জা প্রভৃতি বিবিধ অপূর্বজাতীয় দুর্লভ পদার্থের ফর্দ করিয়া বসিতাম— অথচ চাঁদ তখনো যেখানে ছিল এখনো সেখানেই থাকিত। কিন্তু ছড়ার চাঁদকে ছড়ার লোকেরা মিথ্যা প্রলোভন দিতে সাহস করিত না— খোকার কপালে টী দিয়া যাইবার জন্য নামিয়া আসা চাঁদের পক্ষে যে একেবারেই অসম্ভব তাহা তাহারা মনে করিত না। এমন ঘোরতর বিশ্বাসহীন সন্দিগ্ধ নাস্তিক-প্রকৃতি তাহারা ছিল না। সুতরাং ভাণ্ডারে যাহা মজুত আছে, তহবিলে যাহা কুলাইয়া উঠে, কবিত্বের উৎসাহে তাহার অপেক্ষা অত্যন্ত অধিক কিছু স্বীকার করিয়া বসিতে পারিত না। আমাদের বাংলাদেশের চাঁদামামা বাংলাদেশের সহস্র কুটির হইতে সুকণ্ঠের সহস্র নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হইয়া চুপিচুপি হাস্য করিত; হাঁ'ও বলিত না, না'ও বলিত না; এমন ভাব দেখাইত যেন কোন্‌দিন, কাহাকেও কিছু সংবাদ না দিয়া, পূর্বদিগন্তে যাত্রারম্ভ করিবার সময়, অমনি পথের মধ্যে কৌতুক-প্রফুল্ল পরিপূর্ণ হাস্যমুখখানি লইয়া ঘরের কানাচে আসিয়া দাঁড়াইবে।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, এই ছড়াগুলিকে একটি আস্ত জগতের ভাঙা টুকরা বলিয়া বোধ হয়। উহাদের মধ্যে বিচিত্র বিস্মৃত সুখদুঃখ শতধা-বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পুরাতন পৃথিবীর প্রাচীন সমুদ্রতীরে কর্দমতটের উপর বিলুপ্তবংশ সেকালের পাখিদের পদচিহ্ন পড়িয়াছিল— অবশেষে কালক্রমে কঠিন চাপে সেই কর্দম, পদচিহ্নরেখা-সমেত, পাথর হইয়া গিয়াছে— সে চিহ্ন

আপনি পড়িয়াছিল এবং আপনি রহিয়া গেছে— কেহ খোন্তা দিয়ে খুদে নাই, কেহ বিশেষ যত্নে তুলিয়া রাখে নাই— তেমনি এই ছড়াগুলির মধ্যে অনেক দিনের অনেক হাসিকান্না আপনি অঙ্কিত হইয়াছে, ভাঙাচোরা ছন্দগুলির মধ্যে অনেক হৃদয়বেদনা সহজেই সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কত কালের এক-টুকরা মানুষের মন কালসমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে এই বহুদূরবর্তী বর্তমানের তীরে আসিয়া উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে; আমাদের মনের কাছে সংলগ্ন হইবামাত্র তাহার সমস্ত বিস্মৃত বেদনা জীবনের উত্তাপে লালিত হইয়া আবার অশ্রুরসে সজীব হইয়া উঠিতেছে।

ও পারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্,
এ পারেতে লঙ্কা গাছটি রাঙা টুক্‌টুক্ করে।
গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে॥

এ মাসটা থাক্ দিদি, কেঁদে ককিয়ে।
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কি সাজিয়ে॥

হাড় হল ভাজা-ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥

এই অন্তর্ব্যথা, এই রুদ্ধ সঞ্চিত অশ্রুজলোচ্ছ্বাস, কোন্ কালে কোন্ গোপন গৃহকোণ হইতে কোন্ অজ্ঞাত অখ্যাত বিস্মৃত নববধূর কোমল হৃদয়খানি বিদীর্ণ করিয়া বাহির হইয়াছিল! এমন কত অসহ্য কষ্ট জগতে কোনো চিহ্ন না রাখিয়া অদৃশ্য দীর্ঘনিশ্বাসের মতো বায়ুস্রোতে বিলীন হইয়াছে! এটা কেমন করিয়া দৈবক্রমে একটি শ্লোকের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

ও পারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্।

এমন দিনে এমন অবস্থায় মন-কেমন না করিয়া থাকিতে পারে না। চিরকালই

এমনি হইয়া আসিতেছে। বহুপূর্বে উজ্জয়িনী-রাজসভার মহাকবিও বলিয়া গিয়াছেন—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ।
........................কিং পুনর্দূরসংস্থে॥

কালিদাস যে কথাটি ঈষৎ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র এই ছড়ায় সেই কথাটা বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছে—

গুণবতী ভাই আমার, মন কেমন করে···
হাড় হল ভাজা ভাজা, মাস হল দড়ি।
আয় রে আয় নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি॥

ইহার ভিতরকার সমস্ত মর্মান্তিক কাহিনী, সমস্ত দুর্বিষহ বেদনাপরম্পরা কে বলিয়া দিবে? দিনে দিনে রাত্রে রাত্রে মুহূর্তে মুহূর্তে কত সহ্য করিতে হইয়াছিল—এমন সময়, সেই স্নেহস্মৃতিহীন সুখহীন পরের ঘরে হঠাৎ একদিন তাহার পিতৃগৃহের চিরপরিচিত ব্যথার ব্যথী ভাই আপন ভগিনীটির তত্ত্ব লইতে আসিয়াছে—হৃদয়ের স্তরে স্তরে সঞ্চিত নিগূঢ় অশ্রুরাশি সেদিন আর কি বাধা মানিতে পারে! সেই ঘর, সেই খেলা, সেই বাপ-মা, সেই সুখশৈশব সমস্ত মনে পড়িয়া আর কি এক দণ্ড দুরন্ত উতলা হৃদয়কে বাঁধিয়া রাখা যায়! সেদিন কিছুতে আর একটি মাসের প্রতীক্ষাও প্রাণে সহিতেছিল না—বিশেষত, সেদিন নদীর ও পার নিবিড় মেঘে কালো হইয়া আসিয়াছিল; বৃষ্টি ঝম্‌ঝম্ করিয়া পড়িতেছিল; ইচ্ছা হইতেছিল বর্ষার বৃষ্টিধারামুখরিত, মেঘচ্ছায়াশ্যামল, কূলে-কূলে-পরিপূর্ণ অগাধ শীতল নদীটির মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া এখনই হাড়ের ভিতরকার জ্বালাটা নিবাইয়া আসি। ইহার মধ্যে একটি ব্যাকরণের ভুল আছে, সেটিকে বঙ্গভাষার সতর্ক অভিভাবকগণ মার্জনা করিবেন, এমন-কি, তাহার উপরেও একবিন্দু অশ্রুপাত করিবেন। ভাইয়ের প্রতি 'গুণবতী' বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া

উক্ত অজ্ঞাতনাম্নী কন্যাটি অপরিমেয় মূর্খতা প্রকাশ করিয়াছিল। সে হতভাগিনী স্বপ্নেও জানিত না, তাহার সেই একটি দিনের মর্মভেদী ক্রন্দনধ্বনির সহিত এই ব্যাকরণের ভুলটুকুও জগতে চিরস্থায়ী হইয়া যাইবে। জানিলে লজ্জায় মরিয়া যাইত। হয়তো ভুলটি গুরুতর নহে; হয়তো ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া কথাটা বলা হইতেছে এমনও হইতে পারে। সম্প্রতি যাঁহারা বঙ্গভাষার বিশুদ্ধিরক্ষাব্রতে ভাষাগত প্রথা এবং পুরাতন সৌন্দর্যগুলিকে বলিদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন ভরসা করি তাঁহারাও মাঝে মাঝে স্নেহবশত আত্মবিস্মৃত হইয়া ব্যাকরণলঙ্ঘন-পূর্বক ভগিনীকে ভাই বলিয়া থাকেন, এমন-কি, পত্নীশ্রেণীয় সম্পর্কের দ্বারা প্রীতিপূর্ণ ভ্রাতৃসম্বোধনে অভিহিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের ভ্রম সংশোধন করিয়া দেন না।

আমাদের বাংলাদেশের এক কঠিন অন্তরবেদনা আছে—মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো। অপ্রাপ্তবয়স্ক অনভিজ্ঞ মূঢ় কন্যাকে পরের ঘরে যাইতে হয়, সেইজন্য বাঙালি কন্যার মুখে সমস্ত বঙ্গদেশের একটি ব্যাকুল করুণ দৃষ্টি নিপতিত রহিয়াছে। সেই সকরুণ কাতর স্নেহ, বাংলার শারদোৎসবে স্বর্গীয়তা লাভ করিয়াছে। আমাদের এই ঘরের স্নেহ, ঘরের দুঃখ, বাঙালির গৃহের এই চিরন্তন বেদনা হইতে অশ্রুজল আকর্ষণ করিয়া লইয়া বাঙালির হৃদয়ের মাঝখানে শারদোৎসব পল্লবে ছায়ায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা বাঙালির অম্বিকাপূজা, এবং বাঙালির কন্যাপূজাও বটে। আগমনী এবং বিজয়া বাংলার মাতৃহৃদয়ের গান। অতএব সহজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আমাদের ছড়ার মধ্যেও বঙ্গজননীর এই মর্মব্যথা নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে।

আজ দুর্গার অধিবাস, কাল দুর্গার বিয়ে।
দুর্গা যাবেন শ্বশুরবাড়ি সংসার কাঁদায়ে॥

মা কাঁদেন মা কাঁদেন ধুলায় লুটায়ে
সেই-যে মা পলাকাটি দিয়েছেন গলা সাজায়ে ॥
বাপ কাঁদেন বাপ কাঁদেন দরবারে বসিয়ে
সেই-যে বাপ টাকা দিয়েছেন সিন্ধুক সাজায়ে ॥
মাসি কাঁদেন মাসি কাঁদেন হেঁশেলে বসিয়ে
সেই-যে মাসি ভাত দিয়েছেন পাথর সাজিয়ে ॥
পিসি কাঁদেন পিসি কাঁদেন গোয়ালে বসিয়ে
সেই-যে পিসি দুধ দিয়েছেন বাটি সাজিয়ে ॥
ভাই কাঁদেন ভাই কাঁদেন আঁচল ধরিয়ে
সেই-যে ভাই কাপড় দিয়েছেন আল্না সাজিয়ে ॥
বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে
সেই-যে বোন—

এইখানে, পাঠকদিগের নিকট অপরাধী হইবার আশঙ্কায় ছড়াটি শেষ করিবার পূর্বে দুই-একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ করি। যে ভগিনীটি আজ খাটের খুরা ধরিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র অশ্রুমোচন করিতেছেন তাঁহার পূর্বব্যবহার কোনো ভদ্রকন্যার অনুকরণীয় নহে। বোনে বোনে কলহ না হওয়াই ভালো, তথাপি সাধারণত এরূপ কলহ নিত্য ঘটিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া কন্যাটির মুখে এমন ভাষা ব্যবহার হওয়া উচিত হয় না যাহা আমি অন্য ভদ্রসমাজে উচ্চারণ করিতে কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি। তথাপি সে ছত্রটি একেবারেই বাদ দিতে পারিতেছি না কারণ তাহার মধ্যে কতকটা ইতর ভাষা আছে বটে কিন্তু তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ করুণরস আছে। ভাষান্তরিত করিয়া বলিতে গেলে মোট কথা এই দাঁড়ায় যে, এই রোরুদ্যমানা বালিকাটি ইতিপূর্বে কলহকালে তাঁহার সহোদরাকে ভর্তৃখাদিকা বলিয়া অপমান করিয়াছেন। আমরা সেই গালিটিকে অপেক্ষাকৃত অনতিরূঢ় ভাষায় পরিবর্তন করিয়া

নিম্নে ছন্দ পূরণ করিয়া দিলাম—

বোন কাঁদেন বোন কাঁদেন খাটের খুরো ধরে
সেই-যে বোন গাল দিয়েছেন স্বামীখাকী বলে॥

মা অলংকার দিয়াছেন, বাপ অর্থ দিয়াছেন, মাসি ভাত খাওয়াইয়াছেন, পিসি দুধ খাওয়াইয়াছেন, ভাই কাপড় কিনিয়া দিয়াছেন—আশা করিয়াছিলাম এমন স্নেহের পরিবারে ভগিনীও অনুরূপ কোনো প্রিয়কার্য করিয়া থাকিবেন। কিন্তু হঠাৎ শেষ ছত্রটা পড়িয়াই বক্ষে একটা আঘাত লাগে এবং চক্ষুও ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠে। মা-বাপের পূর্বতন স্নেহব্যবহারের সহিত বিদায়কালীন রোদনের একটা সামঞ্জস্য আছে—তাহা প্রত্যাশিত। কিন্তু যে ভগিনী সর্বদা ঝগড়া করিত এবং অকথ্য গালি দিত, বিদায়কালে তাহার কান্না যেন সব চেয়ে সকরুণ। হঠাৎ আজ বাহির হইয়া পড়িল যে, তাহার সমস্ত দ্বন্দ্বকলহের মাঝখানে একটি সুকোমল স্নেহ গোপনে সঞ্চিত হইতেছিল—সেই অলক্ষিত স্নেহ সহসা সুতীব্র অনুশোচনার সহিত আজ তাহাকে বড়ো কঠিন আঘাত করিল। সে খাটের খুরা ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাল্যকালে এই এক খাটে তাহারা দুই ভগিনী শয়ন করিত, এই শয়নগৃহই তাহাদের সমস্ত কলহবিবাদ এবং সমস্ত খেলাধুলার লীলাক্ষেত্র ছিল। বিচ্ছেদের দিনে এই শয়ন-ঘরে আসিয়া, এই খাটের খুরা ধরিয়া, নির্জনে গোপনে দাঁড়াইয়া, ব্যথিত বালিকা যে ব্যাকুল অশ্রুপাত করিয়াছিল, সেই গভীর স্নেহ-উৎসের নির্মল জলধারায় কলহভাষার সমস্ত কলঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া শুভ্র হইয়া গিয়াছে।

এই-সমস্ত ছড়ার মধ্যে একটি ছত্রে, একটি কথায়, সুখদুঃখের এক-একটি বড়ো বড়ো অধ্যায় উহ্য রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে যে ছড়াটি উদ্‌ধৃত করিতেছি তাহার দুই ছত্রে আদ্যকাল হইতে অদ্যকাল পর্যন্ত বঙ্গীয় জননীর কত দিনের শোকের ইতিহাস ব্যক্ত হইয়াছে—

দোল দোল দুলুনি।
রাঙা মাথায় চিরুনি ॥
বর আসবে এখনি।
নিয়ে যাবে তখনি ॥
কেঁদে কেন মর।
আপনি বুঝিয়া দেখো কার ঘর কর ॥

একটি শিশুকন্যাকেও দোল দিতে দিতে দূরভবিষ্যৎবর্তী বিচ্ছেদসম্ভাবনা স্বতই মনে উদয় হয় এবং মায়ের চক্ষে জল আসে। তখন একমাত্র সান্ত্বনার কথা এই যে, এমনি চিরদিন হইয়া আসিতেছে। তুমিও একদিন মাকে কাঁদাইয়া পরের ঘরে চলিয়া আসিয়াছিলে—আজিকার সংসার হইতে সেদিনকার নিদারুণ বিচ্ছেদের সেই ক্ষতবেদনার সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গিয়াছে—তোমার মেয়েও যথাকালে তোমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং সে দুঃখও বিশ্বজগতে অধিক দিন স্থায়ী হইবে না।

পুঁটুর শ্বশুরবাড়ি-প্রয়াণের অনেক ছবি এবং অনেক প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। সে কথাটা সর্বদাই মনে লাগিয়া আছে।

[১]পুঁটু যাবে শ্বশুরবাড়ি সঙ্গে যাবে কে।
ঘরে আছে কুনো বেড়াল কোমর বেঁধেছে ॥
আম কাঁঠালের বাগান দেব ছায়ায় ছায়ায় যেতে।
চার মিন্‌সে কাহার দেব পাল্কি বহাতে ॥
সরু ধানের চিঁড়ে দেব পথে জল খেতে।
চার মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে ॥
উড়কি ধানের মুড়কি দেব শাশুড়ি ভুলাতে ॥

১ নিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী -সংকলিত 'ছেলেভুলানো ছড়া'য় পাঠান্তর দ্রষ্টব্য।

শেষ ছত্র দেখিলেই বিদিত হওয়া যায়, শাশুড়ি কিসে ভুলিবে এই পরম দুশ্চিন্তা তখনো সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু উড়কি ধানের মুড়কি দ্বারাই সেই দুঃসাধ্য ব্যাপার সাধন করা যাইত এ কথা যদি বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে নিঃসন্দেহ এখনকার অনেক কন্যার মাতা সেই সত্যযুগের জন্য গভীর দীর্ঘনিশ্বাস-সহকারে আক্ষেপ করিবেন। এখনকার দিনে কন্যার শাশুড়িকে যে কী উপায়ে ভুলাইতে হয় কন্যার পিতা তাহা ইহজন্মেও ভুলিতে পারেন না।

কন্যার সহিত বিচ্ছেদ একমাত্র শোকের কারণ নহে, অযোগ্য পাত্রের সহিত বিবাহ সেও একটা বিষম শেল। অথচ, অনেক সময় জানিয়া শুনিয়া মা-বাপ এবং আত্মীয়েরা স্বার্থ অথবা ধন অথবা কুলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া নিরুপায় বালিকাকে অপাত্রে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। সেই অন্যায়ের বেদনা সমাজ মাঝে মাঝে প্রকাশ করে। ছড়ায় তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু পাঠকদের এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ছড়ার সকল কথাই ভাঙাচোরা হাসিতে কান্নাতে অদ্ভুতে মেশানো।

ডালিম গাছে পর্‌ভু নাচে।
তাক্‌ধুমাধুম বাদ্দি বাজে॥
আয়ী গো চিনতে পার?
গোটাদুই অন্ন বাড়ো॥
অন্নপূর্ণা[২] দুধের সর।
কাল যাব গো পরের ঘর॥
পরের বেটা মারলে চড়।
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর॥
খুড়ো দিলে বুড়ো বর॥

২ পাঠান্তর: অন্নব্যঞ্জন

হেই খুড়ো তোর পায়ে ধরি।
থুয়ে আয় গা মায়ের বাড়ি।
মায়ে দিল সরু শাঁখা বাপে দিল শাড়ি।
ভাই দিলে হুড়কো ঠেঙা 'চল্ শ্বশুরবাড়ি'।

তখন ইংরাজের আইন ছিল না। অর্থাৎ দাম্পত্য অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ভার পাহারাওয়ালার হাতে ছিল না। সুতরাং আত্মীয়গণকে উদ্‌যোগী হইয়া সেই কাজটা যথাসাধ্য সহজে এবং সংক্ষেপে সাধন করিতে হইত। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় ঘরের বধূ-শাসনের জন্য পুলিসের আইনের চেয়ে সেই *গার্হস্থ্য আইন, কন্‌স্টেবলের হ্রস্ব যষ্টির* অপেক্ষা সহোদর ভ্রাতার হুড়কো ঠেঙা, ছিল ভালো। আজ আমরা স্ত্রীকে বাপের বাড়ি হইতে ফিরাইবার জন্য আদালত করিতে শিখিয়াছি, কাল হয়তো মান ভাঙাইবার জন্য প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু হাল নিয়মেই হউক আর সাবেক নিয়মেই হউক, নিতান্ত পাশব বলের দ্বারা অসহায়া কন্যাকে অযোগ্যের সহিত যোজনা— এতবড়ো অস্বাভাবিক বর্বর নৃশংসতা জগতে আর আছে কি না সন্দেহ।

বাপ-মায়ের অপরাধ সমাজ বিস্মৃত হইয়া আসে, কিন্তু বুড়া বরটা তাহার চক্ষুশূল। সমাজ সুতীব্র বিদ্রূপের দ্বারা তাহার উপরেই মনের সমস্ত আক্রোশ মিটাইতে থাকে।

তালগাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল[৩] ঝি।
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কী॥
টক্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম কানে মদনকড়ি।
বিয়ের বেলা দেখে এলুম বুড়ো চাপদাড়ি॥

৩ পাঠান্তর: হেন

চোখ খাও গো বাপ-মা, চোখ খাও গো খুড়ো।
এমন বরকে বিয়ে দিয়েছিলে তামাকখেগো বুড়ো॥
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে, বুড়ো মরে কেশে।
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে।
ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে॥

বৃদ্ধের এমন লাঞ্ছনা আর কী হইতে পারে!

এক্ষণে বঙ্গগৃহের যিনি সম্রাট, যিনি বয়সে ক্ষুদ্রতম অথচ প্রতাপে প্রবলতম, সেই মহামহিম খোকা-খুকু বা খুকুনের কথাটা বলা বাকি আছে।

প্রাচীন ঋগ্বেদ ইন্দ্র-চন্দ্র-বরুণের স্তবগান উপলক্ষে রচিত— আর মাতৃহৃদয়ের যুগলদেবতা খোকা এবং পুঁটুর স্তব হইতে ছড়ার উৎপত্তি। প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই ন্যূন নহে। কারণ, ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিক পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন। তাহা আপনার আদিম সরলতাগুণে মানবরচনার সর্বপ্রথম। সে এই উনবিংশ শতাব্দীর বাষ্পলেশশূন্য তীব্র মধ্যাহ্নরৌদ্রের মধ্যেও মানবহৃদয়ের নবীন অরুণোদয়রাগ রক্ষা করিয়া আছে।

এই চিরপুরাতন নববেদের মধ্যে যে স্নেহগাথা, যে শিশুস্তবগুলি রহিয়াছে তাহার বৈচিত্র্য সৌন্দর্য এবং আনন্দ-উচ্ছ্বাসের আর সীমা নাই। মুগ্ধহৃদয়া বন্দনাকারিণীগণ নব নব স্নেহের ছাঁচে ঢালিয়া এক খুকুদেবতার কত মূর্তিই প্রতিষ্ঠা করিয়াছে— সে কখনো পাখি, কখনো চাঁদ, কখনো মানিক, কখনো ফুলের বন।

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী।
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি॥

ভালোবাসার মতো এমন সৃষ্টিছাড়া পদার্থ আর কিছুই নাই। সে আরম্ভকাল হইতে এই সৃষ্টির আদি-অন্তে অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে তথাপি সৃষ্টির নিয়ম সমস্তই লঙ্ঘন করিতে চায়। সে যেন সৃষ্টির লৌহ-

পিঞ্জরের মধ্যে আকাশের পাখি। শতসহস্র বার প্রতিষেধ প্রতিরোধ প্রতিবাদ প্রতিঘাত পাইয়াও তাহার এ বিশ্বাস কিছুতেই গেল না যে, সে অনায়াসেই নিয়ম না মানিয়া চলিতে পারে। সে মনে মনে জানে 'আমি উড়িতে পারি', এইজন্যই সে লোহার শলাকাগুলাকে বারংবার ভুলিয়া যায়। ধনকে লইয়া বনকে যাইবার কোনো আবশ্যক নাই, ঘরে থাকিলে সকল পক্ষেই সুবিধা। অবশ্য, বনে অনেকটা নিরালা পাওয়া যায় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা ছাড়া আর বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। বিশেষত নিজেই স্বীকার করিতেছে, সেখানে উপযুক্ত পরিমাণে আহার্য দ্রব্যের অসদ্ভাব ঘটিতে পারে। কিন্তু তবু ভালোবাসা জোর করিয়া বলে, 'তোমরা কি মনে কর আমি পারি না?' তাহার এই অসংকোচ স্পর্ধাবাক্য শুনিয়া আমাদের মতো প্রবীণবুদ্ধি বিবেচক লোকেরও হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হইয়া যায়—আমরা বলি, তাও তো বটে, কেনই বা না পারিবে? যদি কোনো সংকীর্ণহৃদয় বস্তু-জগৎ-বদ্ধ সংশয়ী জিজ্ঞাসা করে 'খাইবে কী', সে তৎক্ষণাৎ অম্লানমুখে উত্তর দেয়, 'নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি।' শুনিবামাত্র আমরা মনে করি, ঠিক সংগত উত্তরটি পাওয়া গেল। অন্যের মুখে যাহা ঘোরতর স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা, যাহা উন্মাদের অত্যুক্তি, ভালোবাসার মুখে তাহা অবিসম্বাদিত প্রামাণিক কথা।

ভালোবাসার আর-একটি গুণ এই যে, সে এককে আর করিয়া দেয়। ভিন্ন পদার্থের প্রভেদসীমা মানিতে চাহে না। পাঠক পূর্বেই তাহার উদাহরণ পাইয়াছেন; দেখিয়াছেন একটা ছড়ায় কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়া খোকাকে অনায়াসেই পক্ষীজাতীয়ের শামিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে—কোনো প্রাণীবিজ্ঞানবিৎ তাহাতে আপত্তি করিতে আসেন না। আবার পরমুহূর্তেই খোকাকে যখন আকাশের চন্দ্রের অভেদ আত্মীয়রূপে বর্ণনা করা হয় তখন কোনো জ্যোতির্বিদ্ তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস

করেন না। কিন্তু সর্বাপেক্ষা ভালোবাসার স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ পায় যখন সে আড়ম্বর-পূর্বক যুক্তির অবতারণা করিয়া ঠিক শেষ মুহূর্তে তাহাকে অবজ্ঞাভরে পদাঘাত করিয়া ভাঙিয়া ফেলে। নিম্নে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

চাঁদ কোথা পাব বাছা, জাদুমণি!
মাটির চাঁদ নয়[৪] গড়ে দেব
গাছের চাঁদ নয়[৪] পেড়ে দেব—
তোর মতন চাঁদ কোথায় পাব।
তুই চাঁদের শিরোমণি।
ঘুমো রে আমার খোকামণি।

চাঁদ আয়ত্তগম্য নহে, চাঁদ মাটির গড়া নহে, গাছের ফল নহে, এ-সমস্তই বিশুদ্ধ যুক্তি, অকাট্য এবং নূতন—ইহার কোথাও কোনো ছিদ্র নাই। কিন্তু এতদূর পর্যন্ত আসিয়া অবশেষে যদি খোকাকে বলিতে হয় যে তুমিই চাঁদ এবং তুমি সকল চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ, তবে তো মাটির চাঁদও সম্ভব, গাছের চাঁদও আশ্চর্য নহে। তবে গোড়ায় যুক্তির কথা পাড়িবার প্রয়োজন কী ছিল?

এইখানে বোধ করি একটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। স্ত্রীলোকদের মধ্যে যে বহুল পরিমাণে যুক্তিহীনতা দেখা যায় তাহা বুদ্ধি-হীনতার পরিচয় নহে। তাঁহারা যে জগতে থাকেন সেখানে ভালোবাসারই একাধিপত্য। ভালোবাসা স্বর্গের মানুষ। সে বলে, আমার অপেক্ষা আর কিছু কেন প্রধান হইবে? আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়াই বিশ্বনিয়মের সমস্ত বাধা কেন অপসারিত হইবে না? সে স্বপ্ন দেখিতেছে এখনো সে স্বর্গেই আছে। কিন্তু হায়, মর্ত-পৃথিবীতে স্বর্গের মতো ঘোরতর অযৌক্তিক পদার্থ

৪ নয়=নাহয়, নহে যে—এরূপ বিভিন্ন অর্থ হইতে পারে

আর কী হইতে পারে! তথাপি পৃথিবীতে যেটুকু স্বর্গ আছে সে কেবল রমণীতে বালকে প্রেমিকে ভাবুকে মিলিয়া সমস্ত যুক্তি এবং নিয়মের প্রতিকূল স্রোতেও ধরাতলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। পৃথিবী যে পৃথিবীই এ কথা তাহারা অনেক সময় ভুলিয়া যায় বলিয়াই, সেই ভ্রমক্রমেই পৃথিবীতে দেবলোক স্খলিত হইয়া পড়ে।

ভালোবাসা এক দিকে যেমন প্রভেদসীমা লোপ করিয়া চাঁদে ফুলে খোকায় পাখিতে এক মুহূর্তে একাকার করিয়া দিতে পারে, তেমনি আবার আর-এক দিকে যেখানে সীমা নাই সেখানে সীমা টানিয়া দেয়, যেখানে আকার নাই সেখানে আকার গড়িয়া বসে।

এ পর্যন্ত কোনো প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত ঘুমকে স্তন্যপায়ী অথবা অন্য কোনো জীবশ্রেণীতে বিভক্ত করেন নাই। কিন্তু ঘুম নাকি খোকার চোখে আসিয়া থাকে, এইজন্য তাহার উপরে সর্বদাই ভালোবাসার সৃজনহস্ত পড়িয়া সেও কখন একটা মানুষ হইয়া উঠিয়াছে।

হাটের ঘুম, ঘাটের ঘুম, পথে পথে ফেরে।
চার কড়া দিয়ে কিন্‌লেম ঘুম, মণির চোখে আয় রে॥

রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন তো আর হাটে ঘাটে লোক নাই। সেইজন্য সেই হাটের-ঘুম, ঘাটের-ঘুম নিরাশ্রয় হইয়া অন্ধকারে পথে পথে মানুষ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। বোধ করি সেইজন্যই তাহাকে এত সুলভ মূল্যে পাওয়া গেল। নতুবা সমস্ত রাত্রির পক্ষে চার কড়ার কড়ি এখনকার কালের মজুরির তুলনায় নিতান্তই যৎসামান্য।

শুনা যায় গ্রীক কবিগণ এবং মাইকেল মধুসূদন দত্তও ঘুমকে স্বতন্ত্র মানবী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু নৃত্যকে একটা নির্দিষ্ট বস্তুরূপে গণ্য করা কেবল আমাদের ছড়ার মধ্যেই দেখা যায়।

থেনা নাচন থেনা। বট পাকুড়ের ফেনা ॥
বলদে খালো চিনা, ছাগলে খালো ধান।
সোনার জাদুর জন্যে যায়ে নাচ্‌না কিনে আন ॥

কেবল তাহাই নহে। খোকার প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এই নৃত্যকে স্বতন্ত্র সীমাবদ্ধ করিয়া দেখা সেও বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণ বা অণুবীক্ষণের দ্বারা সাধ্য নহে, স্নেহবীক্ষণের দ্বারাই সম্ভব।

হাতের নাচন, পায়ের নাচন, বাটা মুখের নাচন—
নাটা চক্ষের নাচন, কাঁটালি ভুরুর নাচন।
বাঁশির নাকের নাচন, মাজা বেঙ্কুর নাচন—
আর নাচন কী।
অনেক সাধন ক'রে
জাদু পেয়েছি ॥

ভালোবাসা কখনো অনেককে এক করিয়া দেখে, কখনো এককে অনেক করিয়া দেখে, কখনো বৃহৎকে তুচ্ছ এবং কখনো তুচ্ছকে বৃহৎ করিয়া তুলে। 'নাচো রে নাচো রে জাদু, নাচনখানি দেখি!' নাচনখানি! যেন জাদু হইতে তাহার নাচনখানিকে পৃথক করিয়া একটি স্বতন্ত্র পদার্থের মতো দেখা যায়; যেন সেও একটি আদরের জিনিস। 'খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমাগীদের পাড়া।' এ স্থলে 'বেড়ু করতে' না বলিয়া 'বেড়াইতে' বলিলেই প্রচলিত ভাষার গৌরব রক্ষা করা হইত, কিন্তু তাহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোর গৌরব হ্রাস হইত। পৃথিবীসুদ্ধ লোক বেড়াইয়া থাকে, কিন্তু খোকাবাবু 'বেড়ু' করেন। উহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোটি একটু বিশেষ স্বতন্ত্র এবং স্নেহাস্পদ পদার্থরূপে প্রকাশ পায়।

খোকা এল বেড়িয়ে।
দুধ দাও গো জুড়িয়ে ॥

দুধের বাটি তপ্ত।
খোকা হলেন খ্যাপ্ত॥
খোকা যাবেন নায়ে।
লাল জুতুয়া পায়ে॥

অবশ্য, খোকাবাবু ভ্রমণ সমাধা করিয়া আসিয়া দুধের বাটি দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন, সে ঘটনাটি গৃহরাজ্যের মধ্যে একটি বিষম ঘটনা এবং তাঁহার যে নৌকারোহণে ভ্রমণের সংকল্প আছে ইহাও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য— কিন্তু পাঠকগণ শেষ ছত্রের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন। আমরা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজের দোকান হইতে আজানুসমুত্থিত বুট কিনিয়া অত্যন্ত মচ্ মচ্ শব্দ করিয়া বেড়াই তথাপি লোকে তাহাকে জুতা অথবা জুতি বলিবে মাত্র। কিন্তু খোকাবাবুর অতি ক্ষুদ্র কোমল চরণযুগলে ছোটো-ঘুন্টি-দেওয়া অতিক্ষুদ্র সামান্য মূল্যের রাঙা জুতাজোড়া সেটা হইল 'জুতুয়া'! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে জুতার আদরও অনেকটা পদসম্ভ্রমের উপরেই নির্ভর করে, তাহার অন্য মূল্য কাহারও খবরেই আসে না।

সর্বশেষে, উপসংহারকালে আর-একটি কথা লক্ষ্য করিয়া দেখিবার আছে। যেখানে মানুষের গভীর স্নেহ, অকৃত্রিম প্রীতি, সেইখানেই তাহার দেবপূজা। যেখানে আমরা মানুষকে ভালোবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি; ঐ-যে বলা হইয়াছে 'নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি', ইহা দেবতারই ধ্যান। শিশুর ক্ষুদ্র মুখখানির মধ্যে এমন কী আছে যাহা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিবার জন্য, যাহা পরিপূর্ণরূপে উপলব্ধি করিবার জন্য অরণ্যের নিরালার মধ্যে গমন করিতে ইচ্ছা হয়— মনে হয়, সমস্ত সংসার, সমস্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াকর্ম এই আনন্দভাণ্ডার হইতে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে! যোগীগণ যে অমৃত-লালসায় পানাহার ত্যাগ করিয়া অরণ্যের মধ্যে অক্ষুব্ধ অবসর অন্বেষণ করিতেন, জননী নিজের সন্তানের

মুখে সেই দেবদুর্লভ অমৃতরসের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাই তাঁহার অন্তরের উপাসনামন্দির হইতে এই গাথা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে—

ধনকে নিয়ে বনকে যাব, সেখানে খাব কী।
নিরলে বসিয়া চাঁদের মুখ নিরখি॥

সেইজন্য ছড়ার মধ্যে প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়— নিজের পুত্রের সহিত দেবকীর পুত্রকে অনেক স্থলেই মিশাইয়া ফেলা হইয়াছে। অন্য দেশে মনুষ্যে দেবতায় এরূপ মিলাইয়া দেওয়া দেবাপমান বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু আমার বিবেচনায় মনুষ্যের উচ্চতম মধুরতম গভীরতম জীবন্ত সম্বন্ধ-সকল হইতে দেবতাকে সুদূরে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলে মনুষ্যত্বকেও অপমান করা হয়, এবং দেবত্বকেও আদর করা হয় না। আমাদের ছড়ার মধ্যে মর্তের শিশু স্বর্গের দেবপ্রতিমার সঙ্গে যখন-তখন এক হইয়া গিয়াছে— সেও অতি সহজে, অতি অবহেলে— তাহার জন্য স্বতন্ত্র চালচিত্রেরও আবশ্যক হইতেছে না। শিশু-দেবতার অতি অদ্ভুত অসংগত অর্থহীন চালচিত্রের মধ্যেই স্বর্গের দেবতা কখন অলক্ষিতে শিশুর সহিত মিশিয়া আপনি আসিয়া দাঁড়াইতেছেন।

খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমাগীদের পাড়া।
তেলিমাগীরা মুখ করেছে কেন্ রে মাখনচোরা॥
ভাঁড় ভেঙেছে, ননি খেয়েছে আর কি দেখা পাব।
কদমতলায় দেখা পেলে বাঁশি কেড়ে নেব॥

হঠাৎ, তেলিমাগীদের পাড়ায় ক্ষুদ্র খোকাবাবু কখন যে বৃন্দাবনের বাঁশি আনিয়া ফেলিয়াছেন তাহা সে বাঁশি যাহাদের কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়াছে তাহারাই বুঝিতে পারিবে।

আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক।

ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশুহৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতাগুণেই জগদ্ব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে, এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য -বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে— *শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।*

১৩০১

ছেলেভুলানো ছড়া : ২

ভূমিকা

আমাদের অলংকারশাস্ত্রে নয় রসের উল্লেখ আছে, কিন্তু ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীতকোমল দেহের যে স্নেহোদ্‌বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্পচন্দন গোলাপজল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে ; সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এব যুক্তিসংগতিহীন।

শুদ্ধমাত্র এই রসের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াই আমি বাংলাদেশের ছড়া সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। রুচিভেদবশত সে রস সকলের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু এই ছড়াগুলি স্থায়ীভাবে সংগ্রহ করিয়া রাখা কর্তব্য সে বিষয়ে বোধ করি কাহারো মতান্তর হইতে পারে না। কারণ, ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি। বহুকাল হইতে আমাদের দেশের মাতৃভাণ্ডারে এই ছড়াগুলি রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে ; এই ছড়ার মধ্যে আমাদের মাতৃমাতামহীগণের স্নেহসংগীতস্বর জড়িত হইয়া আছে, এই ছড়ার ছন্দে আমাদের পিতৃপিতামহগণের শৈশবনৃত্যের নূপুরনিক্বণ ঝংকৃত হইতেছে। অথচ, আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।

ছড়াগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে ; এইজন্য ইহার অনেকগুলির মধ্যে বাংলার অনেক উপভাষা (dialect) লক্ষিত হইবে। একই ছড়ার অনেকগুলি পাঠও পাওয়া যায় ; তাহার মধ্যে কোনোটিই বর্জনীয় নহে। কারণ, ছড়ায় বিশুদ্ধ পাঠ বা আদিম পাঠ বলিয়া কিছু নির্ণয় করিবার উপায় অথবা প্রয়োজন নাই। কালে কালে মুখে মুখে এই ছড়াগুলি এতই জড়িত মিশ্রিত এবং পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন পাঠের মধ্য হইতে কোনো-একটি বিশেষ পাঠ নির্বাচিত করিয়া লওয়া সংগত হয় না। কারণ, এই কামচারিতা কামরূপধারিতা ছড়াগুলির প্রকৃতিগত। ইহারা অতীত কীর্তির ন্যায় মৃতভাবে রক্ষিত নহে। ইহারা সজীব, ইহারা সচল ; ইহারা দেশকালপাত্র-বিশেষে প্রতিক্ষণে আপনাকে অবস্থার উপযোগী করিয়া তুলিতেছে। ছড়ার সেই নিয়তপরিবর্তনশীল প্রকৃতিটি দেখাইতে গেলে তাহার ভিন্ন ভিন্ন পাঠ রক্ষা করা আবশ্যক।

নিম্নে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক—

প্রথম পাঠ

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজে॥
বাজতে বাজতে চলল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কম্‌লাপুলি॥
কম্‌লাপুলির টিয়েটা।
সুয্যিমামার বিয়েটা॥
আয় রঙ্গ হাটে যাই।
গুয়া পান কিনে খাই॥
একটা পান ফোঁপ্‌রা।
মায়ে ঝিয়ে ঝগড়া॥

কচি কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে খুকু গা তোল্ ॥
আমি তো বটে নন্দঘোষ—
মাথায় কাপড় দে ॥
হলুদ বনে কলুদ ফুল—
তারার নামে টগর ফুল ॥

দ্বিতীয় পাঠ

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ঢাঁই মিরগেল ঘাঘর বাজে ॥
বাজতে বাজতে প'ল ঠুলি।
ঠুলি গেল কম্‌লাফুলি ॥
আয় রে কম্‌লা হাটে যাই।
পান গুয়োটা কিনে খাই ॥
কচি কুমড়োর ঝোল।
ওরে জামাই গা তোল্ ॥
জ্যোৎস্নাতে ফটিক ফোটে—
কদমতলায় কে রে।
আমি তো বটে নন্দঘোষ—
মাথায় কাপড় দে-রে ॥

তৃতীয় পাঠ

আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে।
লাল মিরগেল ঘাঘর বাজে ॥
বাজতে বাজতে এল ডুলি।
ডুলি গেল সেই কম্‌লাপুলি ॥

কম্‌লাপুলির বিয়েটা।
সুয্যিমামার টিয়েটা॥
হাড়মুড়্‌মুড়্‌ কেলে জিরে।
কুসুম কুসুম পানের বিঁড়ে!
রাই রাই রাই রাবণ॥
হলুদ ফুলে কলুদ ফুল।
তারার নামে টগ্‌গর ফুল॥
এক গাচি করে মেয়ে খাঁড়া।
এক গাচি করে পুরুষ খাঁড়া॥
জামাই বেটা ভাত খাবি তো
এখানে এসে বোস্।
খা গণ্ডা গণ্ডা কাঁটালের কোষ॥

উপরি-উদ্ধৃত ছড়াগুলির মধ্যে মূল পাঠ কোন্‌টি তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব, এবং মূল পাঠটি রক্ষা করিয়া অন্য পাঠগুলি ত্যাগ করাও উচিত হয় না। ইহাদের পরিবর্তনগুলিও কৌতুকাবহ এবং বিশেষ আলোচনার যোগ্য। 'আগ্‌ডুম বাগ্‌ডুম ঘোড়াডুম সাজে'—এই ছত্রটির কোনো পরিষ্কার অর্থ আছে কি না জানি না; অথবা যদি ইহা অন্য কোনো ছত্রের অপভ্রংশ হয় তবে সে ছত্রটি কী ছিল তাহাও অনুমান করা সহজ নহে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, প্রথম কয়েক ছত্র বিবাহযাত্রার বর্ণনা। দ্বিতীয় ছত্রে যে বাজনা কয়েকটির উল্লেখ আছে তাহা ভিন্ন ভিন্ন পাঠে কতই বিকৃত হইয়াছে! আবার ভিন্ন স্থান হইতে আমরা এই ছড়ার আর-একটি পাঠ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে আছে—

আগ্‌ডম বাগ্‌ডম ঘোঁড়াডম সাজে।
ডান মেকড়া ঘাঘর বাজে॥

বাজতে বাজতে পড়ল টুরি।
টুরি গেল কমলাপুরী॥

ভাষার যে ক্রমশ কিরূপ রূপান্তর হইতে থাকে এই-সকল ছড়া হইতে তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

ছড়াসংগ্রহ

১

মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের ধারে ঘর।
কথনো মাসি বলেন না যে খই-মোয়াটা ধর্॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
এত দিনে জানিলাম মা বড়ো ধন॥
মাকে দিলুম আমন দোলা।
বাপকে দিলুম নীলে ঘোড়া।
আপনি যাব গৌড়।
আনব সোনার মউর॥
তাইতে দেব ভায়ের বিয়ে।
আপনি নাচব ধেয়ে॥

২

কে মেরেছে কে ধরেছে সোনার গতরে।
আধকাঠা চাল দেব গালের ভিতরে॥
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।
তার সঙ্গে গোসা করে ভাত খাও নি কাল॥
কে মেরেছে কে ধরেছে কে দিয়েছে গাল।
তার সঙ্গে কোঁদল করে আসব আমি কাল॥

মারি নাইকো ধরি নাইকো বলি নাইকো দূর।
সবেমাত্র বলেছি গোপাল, চরাও গে বাছুর॥

৩

পুঁটু নাচে কোন্‌খানে।
শতদলের মাঝখানে।
সেখানে পুঁটু কী করে।
চুল ঝাড়ে আর ফুল পাড়ে।
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে॥

৪

ধন ধোনা ধন ধোনা।
চোতবোশেখের বেনা॥
ধন বর্ষাকালের ছাতা
জাড়কালের কাঁথা॥
ধন চুল বাঁধবার দড়ি
হুড়কো দেবার নড়ি॥
পেতে শুতে বিছানা নেই— ধন ধুলোয় গড়াগড়ি॥
ধন পরানের পেটে।
কোন্ পরানে বলব রে ধন যাও কাদাতে হেঁটে॥
ধন ধোনা ধন ধন।
এমন ধন যার ঘরে নাই তার বৃথায় জীবন।

৫

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ি যেয়ো।
সরু সুতোর কাপড় দেব, ভাত রেঁধে খেয়ো॥

আমার বাড়ির জাদুকে আমার বাড়ি সাজে।
লোকের বাড়ি গেলে জাদু কোঁদলখানি বাজে॥
হোক কোঁদল ভাঙুক খাড়ু।
দু হাতে কিনে দেব ঝালের নাড়ু॥
ঝালের নাড়ু বাছা আমার না খেলে না ছুঁলে।
পাড়ার ছেলেগুলো কেড়ে এসে খেলে॥
গোয়াল থেকে কিনে দেব দুদ্‌ওলা গাই।
বাছার বালাই নিয়ে আমি মরে যাই॥
দুদ্‌ওলা গাইটে পালে হল হারা।
ঘরে আছে আওটা দুধ আর চাঁপাকলা।
তাই দিয়ে জাদুকে ভোলা রে ভোলা॥

৬

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি ঘুমের বাড়ি যেয়ো।
বাটা ভরে পান দেব, গাল ভরে খেয়ো॥
শান-বাঁধানো ঘাট দেব, বেসম মেখে নেয়ো ;
শীতলপাটি পেড়ে দেব, প'ড়ে ঘুম যেয়ো॥
আঁব-কাঁঠালের বাগান দেব, ছায়ায় ছায়ায় যাবে।
চার চার বেয়ারা দেব, কাঁধে করে নেবে॥
দুই দুই বাঁদি দেব, পায়ে তেল দেবে।
উল্‌কি[১] ধানের মুড়্‌কি দেব নারেঙ্গা[২] ধানের খই।
গাছ-পাকা রম্ভা দেব হাঁড়ি-ভরা দই॥

পাঠান্তর : ১ উড়্‌কি ২ বিন্নি (অর্থ : বাছাই)

৭

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমার বাড়ি এসো।
সেজ নেই মাদুর নেই, পুঁটুর চোখে বোসো॥
বাটা ভরে পান দেব, গাল ভরে খেয়ো।
খিড়কি দুয়ার খুলে দেব, ফুড়ুৎ করে যেয়ো॥

৮

ও পাড়াতে যেয়ো না, বঁধু এসেছে।
বঁধুর পাতের ভাত খেয়ো না, ভাব লেগেছে॥
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে রয়েছে।
ঢাকন খুলে দেখো, বড়ো বউর খোকা হয়েছে॥

৯

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো'সে।
তোমার শাশুড়ি বলে গেছে, বেগুন কোটো'সে।
ও বেগুন কুটো না, বীচ রেখেছে।
ও ঘরেতে যেয়ো না, বঁধু এয়েছে॥
বঁধুর পান খেয়ো না, ঝগড়া করেছে।
দাদাকে দেখে কদম-পানা ফুটে উঠেছে॥

১০

পানকৌড়ি পানকৌড়ি ডাঙায় ওঠো'সে।
তোমার শাশুড়ি বলে গেছেন, আলু কোটো'সে॥
কী করে কুটব, চাকা চাকা ক'রে।
ও দুয়োরে যেয়ো না, বঁধু এসেছে।
বঁধুর পান খেয়ো না, ভাব লেগেছে।
ভাব ভাব কদমের ফুল ফুটে উঠেছে॥

১১

ঘুঘু মেতি সই
পুত কই।
হাটে গেছে ॥
হাট কই।
পুড়ে গেছে ॥
ছাই কই।
গোয়ালে আছে ॥
সোনা-কুড়ে পড়বি না
ছাই-কুড়ে পড়বি ॥

১২

ওরে আমার ধন ছেলে
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে ॥
মা ব'লে ব'লে ডাকছিলে ॥
ধুলো-কাদা কত মাক্‌ছিলে ॥
সে যদি তোমার মা হত
ধুলো-কাদা ঝেড়ে কোলে নিত ॥

১৩

পুঁটুমণি গো মেয়ে।
বর দিব চেয়ে ॥
কোন্‌ গাঁয়ের বর।
নিমাই সরকারের বেটা। পাল্‌কি বের কর্‌ ॥
বের করেছি বের করেছি ফুলের ঝারা দিয়ে।
পুঁটুমণিকে নিয়ে যাব বকুলতলা দিয়ে ॥

১৪

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর ধুলো-মাখা গায়।
ধুলো ঝেড়ে করব কোলে আয় নন্দরায়॥

১৫

ধুলোর দোসর নন্দকিশোর গা করেছ খড়ি!
কলুবাড়ি যাও, তেল আন গে, আমি দিব তার কড়ি॥

১৬

আয় রে চাঁদা, আগড় বাঁধা, দুয়ারে বাঁধা হাতি।
চোক ঢুল্‌ঢুল্‌ নয়নতারা, দেখ্‌সে চাঁদের বাজি॥

১৭

বড়োবউ গো ছোটোবউ গো জলকে যাবি গো।
জলের মধ্যে ফুল ফুটেছে দেখতে পাবি গো॥
কেষ্ট বেড়ান কুলে কুলে, তাঁত নিবি গো।
তারি জন্যে মার খেয়েছি, পিঠ দেখো গো॥
বড়োবউ গো ছোটোবউ গো আরেক কথা শুন্‌সে।
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চুড়োবাঁধা মিন্‌সে॥
ঘটি নেয় না বাটি নেয় না, নেয় না সোনার ঝারি—
যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি॥

১৮

খোকা গেছে মাছ ধরতে, দেব্‌তা এল জল।
ও দেব্‌তা তোর পায়ে ধরি খোকন আসুক ঘর॥
কাজ নাইকো মাছে, আগুন লাগুক মাছে।
খোকনের পায়ে কাদা লাগে পাছে॥

১৯

এ পারেতে বেনা, ওপারেতে বেনা।
মাছ ধরেছি চুনোচানা ॥
হাঁড়ির ভিতর ধনে।
গৌরী বেটি কনে ॥
নোকে বেটা বর।
টাঁকশালেতে চাকরি করে, ঘুঘুডাঙায় ঘর ॥
ঘুঘুডাঙায় ঘুঘু মরে চালভাজা খেয়ে।
ঘুঘুর মরণ দেখতে যাব এয়োশাঁখা প'রে ॥
শাঁখাটি ভাঙল। ঘুঘুটি ম'ল ॥

২০

কাঁদুনে রে কাঁদুনে কুলতলাতে বাসা।
পরের ছেলে কাঁদবে ব'লে মনে করেছ আশা ॥
হাত ভাঙব পা ভাঙব, করব নদী পার।
সারারাত কেঁদো না রে, জাদু, ঘুমো একবার ॥

২১

তালগাছেতে হুতুমথুমো, কান আছে পাঁদাড়ু।
মেঘ ডাকছে ব'লে বুক করছে গুরু গুরু ॥
তোমাদের কিসের আনাগোনা।
উড়ে মেড়ার বাপ আসছে দিদিন ধিনা ধিনা ॥

২২

দোল দোল দোলানি।
কানে দেব চৌদানি ॥

কোমরে দেব ভেড়ার টোপ।
ফেটে মরবে পাড়ার লোক॥
মেয়ে নয়কো সাত বেটা—
গড়িয়ে দেব কোমরপাটা॥
দেখ্ শত্তুর চেয়ে—
আমার কত সাধের মেয়ে॥

২৩

ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি চাম চিক্‌ড়ি
চাম কাটে মজুমদার।
ধেয়ে এল দামুদর।
দামুদর ছুতরের পো।
হিঙুল গাছে বেঁধে থো॥
হিঙুল করে কড়্মড়্।
দাদা দিলে জগন্নাথ॥
জগন্নাথের হাঁড়িকুঁড়ি।
দুয়োরে বসে চাল কাঁড়ি॥
চাল কাঁড়তে হল বেলা
ভাত খাওসে দুপুরবেলা॥
ভাতে পড়ল মাছি।
কোদাল দিয়ে চাঁচি॥
কোদাল হল ভোঁতা।
খা ছুতরের মাথা॥

২৪

উলুকেতু দুলুকেতু নলের বাঁশি।
নল ভেঙেছে একাদশী।
একা নল পঞ্চদল।
কে যাবি রে কামার-সাগর॥
কামার-মাগী কেবুকেরানি যেন পাটরানী॥
আক্-বন ডাব-বন।
কুড়ি কিষ্টি বেড়া বন॥
কার পেটের দুয়ো।
কার পেটের সুয়ো॥
ব'লে গেছে চড়ুই রাজা
চোরের পেটে চাল-কড়াই ভাজা॥
কাঠবেড়ালি মদ্দা মাগী কাপড় কেচে দে।
হারদোচ খেলাতে ডুলকি কিনে দে॥
ডুলকির ভিতর পাকা পান।
ছি, হিঁদুর সোয়ামি মোচরমান॥
এক-পাথর কলাপোড়া এক-পাথর ঝোল।
নাচে আমার খুকুমণি, বাজা তোরা ঢোল॥

২৫

উলুকুটু ধুলুকুটু নলের বাঁশি
নল ভেঙেছে একাদশী॥
একা নল পঞ্চদল।
মা দিয়েছে কামারশাল॥

কামার-মাগীর ঘুরঘুরুনি।
অর্পণ দর্পণ। কুড়িগুষ্টি ব্রাহ্মণ॥

২৬

রান্থ কেন কেঁদেছে।
ভিজে কাঠে রেঁধেছে॥
কাল যাব আমি গঞ্জের হাট।
কিনে আনব শুকনো কাঠ॥
তোমার কান্না কেন শুনি।
তোমার শিকেয় তোলা ননি।
তুমি খাও-না সারা দিনই॥

২৭

খোকোমণি দুধের ফেনি ভাব্‌লোর ঘি,
খোকার বিয়ের সময় করব আমি কী।
সাত মাগী দাসী দেব পায়ে তেল দিতে,
সাত মিন্‌সে কাহার দেব দুলান দুলাতে,
সরু ধানের চিড়ে দেব নাগর খেলাতে,
রসকরা নাড়ু দেব শাশুড়ি ভুলাতে॥

২৮

খোকা আমাদের সোনা,
চার পুখুরের কোনা।
বাড়িতে সেকরা ডেকে মোহর কেটে
গড়িয়ে দেব দানা—
তোমরা কেউ কোরো না মানা॥

২৯

থোকা আমাদের লক্ষ্মী।
গলায় দেব তক্তি॥
কাঁকালে দেব হেলে।
পাক দিয়ে দিয়ে নিয়ে বেড়াব
আমাদের ছেলে॥[১]

৩০

ধন ধন ধনিয়ে কাপড় দেব বুনিয়ে।
তাতে দেব হীরের টোপ,
ফেটে মরবে পাড়ার লোক॥

৩১

আল্‌তাসুড়ি গাছের গুঁড়ি জোড়-পুতুলের বিয়ে।
এত টাকা নিলে বাবা, দূরে দিলে বিয়ে॥
এখন কেন কান্‌ছ বাবা গামছা মুড়ি দিয়ে।
আগে কাঁদে মা-বাপ, পাছে কাঁদে পর।
পাড়াপড়শি নিয়ে গেল শ্বশুরদের ঘর॥
শ্বশুরদের ঘরখানি বেতের ছাউনি।
তাতে বসে পান খান দুর্গা ভবানী।
হেঁই দুর্গা, হেঁই দুর্গা, তোমার মেয়ের বিয়ে।
তোমার মেয়ের বিয়ে দাও ফুলের মালা দিয়ে॥
ফুলের মালা গোঁদের ডালা কোন্ সোহাগির বউ।
হীরেদাদার মড়্‌মড়ে থান ঠাকুরদাদার বউ॥

১ পাঠান্তর : হিল্লা দিয়ে বেড়াবে যেন বড়োমানুষের ছেলে॥

এক বাড়িতে দই দিব্য এক বাড়িতে চিঁড়ে।
এমন করে ভোজন করো গোকুনাথের কিরে॥

৩২

হ্যাদে রে কল্‌মিলতা
এতকাল ছিলে কোথা॥
এতকাল ছিলাম বনে।
বনেতে বাগ্‌দি ম'ল,
আমারে যেতে হল।
তুমি নেও কলসী কাঁকে—
আমি নিই বন্দু হাতে।
চলো যাই রাজপথে।
ছেলের মা গয়না গাঁথে,
ছেলেটি তুড়ুক নাচে॥

৩৩

খোকা যাবে নায়ে, রোদ লাগিবে গায়ে—
লক্ষ টাকার মল্‌মলি থান সোনার চাদর গায়ে।
তাতে নাল গোলাপের ফুল
যত বাঙালের মেয়ে দেখে ব্যাকুল।
সয়দাবাদের ময়দা, কাশিম-বাজারের ঘি—
একটু বিলম্ব করো, খোকাকে লুচি ভেজে দি॥[১]

১ পাঠান্তর: উলোর ভুঁয়ের ময়দা রে সয়দাবাদের ঘি।
শান্তিপুরের কড়াই এনে নুচি ভেজে দি॥

৩৪

হুড়্‌হুড়ুনি গুড়্‌গুড়ুনি নদী এল বান।
শিবঠাকুর বিয়ে কল্লেন, তিন কন্যে দান।
এক কন্যে রাঁধেন বাড়েন, এক কন্যে খান।
এক কন্যে না পেয়ে বাপের বাড়ি যান।
বাপেদের তেল-আমলা, মালীদের ফুল—
এমন ক'রে চুল বাঁধব হাজার টাকা মূল।
হাজারে বাজারে পড়ে পেলাম খাঁড়া,
সেই খাঁড়া দিয়ে কাটলাম নাল কচুর দাঁটা॥

৩৫

খোকাবাবু চৌধুরী
গাঁ পেয়েছে আগুড়ি।
মাছ পেয়েছে পবা।
আমার খোকামণির বউ ডাকছে।
ভাত খাওসে বাবা॥

৩৬

একবার নাচো চাঁদের কোণা।
আমি মুরলী বাঁধিয়ে দেব যত লাগে সোনা॥
আবার তোমার নাচন আমি জানি, জানে না ব্রজাঙ্গনা॥

৩৭

শিব নাচে ব্রহ্মা নাচে আর নাচে ইন্দ্র।
গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়ে গোবিন্দ॥
ক্ষীর খিরসে ক্ষীরের নাড়ু মর্তমানের কলা।
হুটিয়ে হুটিয়ে খায় যত গোপের বালা॥

নন্দের মন্দিরে গোয়ালা এল ধেয়ে।
তাঁদের হাতে নড়ি, কাঁধে ভাঁড়—
নাচে থেয়ে থেয়ে ॥

৩৮

খোকা নাচে কোন্‌খানে।
শতদলের মাঝখানে ॥
সেখানে খোকা চুল ঝাড়ে—
থোকা থোকা ফুল পড়ে।
তাই নিয়ে খোকা খেলা করে ॥

৩৯

অন্নপূর্ণা দুধের সর
কাল যাব লো পরের ঘর ॥
পরের বেটা মারলে চড়,
কান্‌তে কান্‌তে খুড়োর ঘর।
খুড়ো দিলে বুড়ো বর ॥
হেঁই খুড়ো তোর পায়ে ধরি
রেখে আয় গে মায়ের বাড়ি ॥
মায়ে দিল সরু শাঁখা
বাপে দিল শাড়ি।
ঝপ্‌ ক'রে মা বিদেয় কর্—
রথ আসছে বাড়ি ॥
আগে আয় রে চৌপল
পিছে যায় রে ডুলি।

দাঁড়া রে কাহার মিনসে মাকে স্থির করি ॥
মা বড়ো নির্বুদ্ধি কেঁদে কেন মর।
আপুনি ভাবিয়ে দেখো কার ঘর কর ॥

৪০

খোকা নাচে বুকের মাঝে—
নাক নিয়ে গেল বোয়াল মাছে ॥
ওরে বোয়াল ফিরে আয়— খোকার নাচন দেখে যা ॥

৪১

মাসি পিসি বনকাপাসি। বনের মধ্যে টিয়ে।
মাসি গিয়েছে বৃন্দাবন দেখে আসি গিয়ে ॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন—
আজ হতে জানলাম মা বড়ো ধন ॥
মাকে দিলাম শাঁখা শাড়ি।
বাপকে দিলাম নীলে ঘোড়া ॥
ভাইয়ের দিলাম বিয়ে—
কলসীতে তেল নেইকো, কিবা সাধের বিয়ে।
কলসীতে তেল নেইকো, নাচব থিয়ে থিয়ে ॥

৪২

মাসি পিসি বনকাপাসি বনের মধ্যে ঘর।
কখনো বল্‌লি নে মাসি কড়ার নাড়ু ধর্‌ ॥

৪৩

খোকো মানিক ধন,
বাড়ি-কাছে ফুলের বাগান,তাতে বৃন্দাবন ॥

৪৪

কিসের লেগে কাঁদ খোকো কিসের লেগে কাঁদ।
কিবা নেই আমার ঘরে।
আমি সোনার বাঁশি বাঁধিয়ে দেব—
মুক্তা থরে থরে ॥

৪৫

ওরে আমার সোনা,
এতখানি রাতে কেন বেহন ধান ভানা ॥
বাড়িতে মানুষ এসেছে তিনজনা।
বাম মাছ রেঁধেলি শোলমাছের পোনা ॥

৪৬

কে ধরেছে কে মেরেছে কে দিয়েছে গাল।
খোকার গুণের বালাই নিয়ে মরে যেন সে কাল ॥

৪৭

কাজল বলে আজল আমি রাঙামুখে যাই।
কালো মুখে গেলে আমার হতমান হয় ॥

৪৮

খোকো আমার কী দিয়ে ভাত খাবে।
নদীর কূলে চিংড়িমাছ বাড়ির বেগুন দিয়ে ॥

৪৯

খোকো যাবে রথে চড়ে, ব্যাঙ হবে সারথি
মাটির পুতুল নটর-পটর, পিঁপড়ে ধরে ছাতি—
ছাতির উপর কোম্পানি কোন্ সাহেবের ধন তুমি ॥

৫০

খোকো যাবে মাছ ধরিতে, গায়ে নাগিবে কাদা।
কলু বাড়ি গিয়ে তেল নেও গে, দাম দেবে তোমার দাদা॥

৫১

খোকো যাবে মাছ ধরিতে ক্ষীরনদীর বিল;
মাছ নয় গুগুলির পেছে উড়ছে দুটো চিল॥

৫২

খোকো যাবে মোষ চরাতে, খেয়ে যাবে কী।
আমার শিকের উপর গমের রুটি, তবলা-ভরা ঘি॥

৫৩

খোকো ঘুমো ঘুমো।
তালতলাতে বাঘ ডাকছে দারুণ হুমো॥

৫৪

ঘুম্‌তা ঘুমায় ঘুম্‌তা ঘুমায় গাছের বাকলা।
ষষ্ঠীতলায় ঘুম যায় মস্ত হাতি ঘোড়া॥
ছাইগাদায় ঘুম যায় খেঁকি কুকুর।
খাটপালঙ্গে ঘুম যায় ষষ্ঠী ঠাকুর।
আমার কোলে ঘুম যায় খোকোমণি॥

৫৫

আতা গাছে তোতা পাখি, দালিম গাছে মউ
কথা কও না কেন বউ॥
কথা কব কী ছলে।
কথা কইতে গা জ্বলে॥

৫৬

ও পারে তিল গাছটি
তিল ঝুর্ ঝুর্ করে।
তারি তলায় মা আমার
লক্ষ্মী-প্রদীপ জ্বালে॥
মা আমার জটাধারী
ঘর নিকুচ্ছেন।
বাবা আমার বুড়োশিব
নৌকা সাজাচ্ছেন॥
ভাই আমার রাজ্যেশ্বর
ঘড়া ডুবাচ্ছেন।
ওই আসছে প্যাখ্‌না বিবি
প্যাক্ প্যাক্ প্যাক্—
ও দাদা দেখ্‌ দেখ্‌ দেখ্‌॥

৫৭

খোকো আমার ধন ছেলে
পথে বসে বসে কান্‌ছিলে॥
রাঙা গায়ে ধুলো মাখছিলে।
মা ব'লে ধন ডাকছিলে॥

৫৮

খোকা খোকা ডাক পাড়ি।
খোকা গিয়েছে কার বাড়ি।
আন গো তোরা লালছড়ি।
খোকাকে মেরে খুন করি॥

৫৯

ঘুমপাড়ানি মাসি পিসি আমাদের বাড়ি যেয়ো।
খাট নেই, পালঙ্ক নেই, খোকার চোখে বোসো॥
খোকার মা বাড়ি নেই, শুয়ে ঘুম যেয়ো।
মাথার নীচে দুধ আছে, টেনে টুনে খেয়ো॥
নিশির কাপড় খসিয়ে দেব, বাঘের নাচন চেয়ো।
বাটা ভরে পান দেব, দুয়োরে বসে খেয়ো।
খিড়কি দুয়োর কেটে দেব ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ যেয়ো॥

৬০

খুকিমণি দুধের ফেনি, বওগাছের মউ।
হাড়ি ডুগ্‌ডুগানি উঠান-ঝাড়নি মণ্ডা-খেকোর বউ॥

৬১

নিদ পাড়ে নিদ পাড়ে গাছের পাতাড়ি।
ষষ্ঠীতলায় নিদ পাড়ে বুড়ো মাথারি॥
খেড়ো ঘরে নিদ পাড়ে কালা কুকুর।
আমাদের বাড়ি নিদ পাড়ে খোকা ঠাকুর॥

৬২

হরম বিবির খড়ম পায়।
লাল বিবির জুতো পায়॥
চল্‌ লো বিবি ঢাকা যাই—
ঢাকা গিয়ে ফল খাই।
সে ফলের বোঁটা নাই॥

৬৩

ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে আর বিলে।
সুন্দরীরে বিয়া দিলাম ডাকাতের মেলে॥
ডাকাত আলো মা,
পাট কাপড় দিয়ে বেড়ে নিলে,
দেখতে দিলে না॥
আগে যদি জান্‌তাম
ডুলি ধরে কান্‌তাম॥

৬৪

ইটা কমলের মা লো ভিটা ছেড়ে দে।
তোর ছাওয়ালের বিয়া, বাগু এনে দে॥
ছোটো বেলায় খেলাইছিলাম ঘুটি মুছি দিয়া।
মা গালাইছিলেন খুবরি বলিয়া॥
এখন কেন কাঁদো মা গো ডুলির খুরা ধরে।
পরের পুতে নিয়ে যাবে ডুম্‌ডুমি বাজিয়ে॥

৬৫

কে রে, কে রে, কে রে—
তপ্ত দুধে চিনির পানা
মণ্ডা ফেলে দে রে॥

৬৬

আয় রে পাখি টিয়ে—
খোকা আমাদের পান খেয়েছে
নজর বাঁধা দিয়ে॥

৬৭

আয় রে পাখি লট্‌কুনা
ভেজে দিব তোরে বব্‌বটনা ॥
খাবি আর কল্‌কলাবি।
খোকাকে নিয়ে ঘুম পাড়াবি ॥

৬৮

ষষ্ঠী বাছা পানের গোছা
তুলে নাড়া রে।
যে আবাগী দেখতে নারে
পাড়া ছেড়ে যা রে ॥

৬৯

ধুলায় ধূসর নন্দকিশোর
ধুলা মেখেছে গায়।
ধুলা ঝেড়ে কোলে করো
সোনার জাদুরায় ॥

৭০

খোকা আমাদের কই্‌—
জলে ভাসে খই।
শুকোলো বাটার পান
অম্বল হল দই ॥

৭১

খোকো খোকো ডাক পাড়ি
খোকো বলে, মা, শাক তুলি ॥

মরুক মরুক শাক তোলা—
খোকো খাবে দুধ কলা ॥

৭২

আমার খোকো যাবে গাই চরাতে—
গাইয়ের নাম হাসি।
আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব
মোহন-চূড়া বাঁশি ॥

৭৩

খোকোর আমার নিদন্তের হাসি
আমি বড়োই ভালোবাসি ॥

৭৪

খোকো যাবে নায়ে লাল জুতুয়া পায়ে।
পাঁচ শো টাকার মল্‌মলি থান
সোনার চাদর গায়ে ॥
তোমরা কে বলিবে কালো।
পাটনা থেকে হলুদ এনে গা ক'রে দিব আলো ॥

৭৫

খোকো ঘুমালো দিব দান
পাব ফুলের ডালি।
কোন্ ঘাটে ফুল তুলেছে
ওরে বনমালী।
চাঁদমুখেতে রোদ লেগেছে,
তুলে ধরো ডালি ॥

খোকো আমাদের ধন,
বাড়িতে নটের বন।
বাহির-বাড়ি ঘর করেছি
সোনার সিংহাসন॥

৭৬

আয় ঘুম আয় কলাবাগান দিয়ে—
হৈঁড়ে-পানা মেঘ করেছে।
লখার মা নথ পরেছে কপাল ফুটো ক'রে।
আমানি খেতে দাঁত ভেঙেছে।
সিঁদুর পরবে কিসে॥

৭৭

খোকোমণির বিয়ে দেব হটমালার দেশে
তারা গাই বলদে চষে॥
তারা হীরের দাঁত ঘষে।
রুইমাছ পালঙের শাক ভারে ভারে আসে
খোকোর দিদি কোণায় বসে বাছে।
কেউ ভুটি চাইতে গেলে বলে আর কি আমার আছে॥

৭৮

এত টাকা নিলে বাবা ছাদ্‌নাতলায় বসে—
এখন কেন কাঁদ বাবা গামছা মুখে দিয়ে।
আমরা যাব পরের ঘরে পর-অধীন হয়ে—
পরের বেটি মুখ করবে মুখ নাড়া দিয়ে।
ছুই চক্ষের জল পড়বে বসুধারা দিয়ে॥

৭৯

ও পারে দুটো শিয়াল চন্দন মেখেছে—
কে দেখেছে, কে দেখেছে, দাদা দেখেছে ॥
দাদার হাতের লাল নাঠিখান ফেলে মেরেছে।
দুই দিকে দুই কাৎলা মাছ ভেসে উঠেছে।
একটা নিলে কিঁয়ের মা, একটা নিলে কিঁয়ে।
ঢোকুম কুম বাজনা বাজে অকার মার বিয়ে ॥

৮০

ওই আসছে খোঁড়া জামাই ডিং ডিং বাজিয়ে।
ক্ষীরের হাঁড়িতে দই প'ল, ছাই থাক্ সে ॥
হাঁড়ায় আছে কাৎলা মাছ ধরে আন্ গে।
দুই দিকে দুই কাৎলা মাছ ভেসে উঠেছে ॥
একটি নিলেন গুরুঠাকুর, একটি নিলে টিয়ে।
টিয়ের মার বিয়ে লাল গামছা দিয়ে।
লাল গামছায় হল নাকো, তসর এনে দে।
তসর করে মসর মসর, শাড়ি এনে দে।
শাড়ির ভারে উঠতে নারি, শালারা কাঁদে ॥

৮১

আলুর পাতায় ছালুরে ভাই, ভেল্লা পাতায় দই।
সকল জামাই এল রে আমার, খোঁড়া জামাই কই।
ওই আসছে খোঁড়া জামাই টুংটুঙি বাজিয়ে ॥
ভাঙা ঘরে শুতে দিলাম ইঁদুরে নিল কান।
কেঁদো না কেঁদো না জামাই, গোরু দিব দান।
সেই গোরুটার নাম থুইয়ো পুণ্যবতীর চাঁদ ॥

কবি-সংগীত

বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবি-ওয়ালাদের গান এক নূতন সামগ্রী এবং অধিকাংশ নূতন পদার্থের ন্যায় ইহার পরমায়ু অতিশয় স্বল্প। একদিন হঠাৎ গোধূলির সময়ে যেমন পতঙ্গে আকাশ ছাইয়া যায়, মধ্যাহ্নের আলোকেও তাহাদিগকে দেখা যায় না এবং অন্ধকার ঘনীভূত হইবার পূর্বেই তাহারা অদৃশ্য হইয়া যায়— এই কবির গানও সেইরূপ এক সময়ে বঙ্গসাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনো তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।

গীতিকবিতা বাংলাদেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, এবং গীতি-কবিতাই বঙ্গসাহিত্যের প্রধান গৌরবস্থল। বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য। রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলগান রাজকণ্ঠের মণি-মালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য। আমাদের বর্তমান সমালোচ্য এই কবির গানগুলিও গান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।

না থাকিবার কিছু কারণও আছে। পূর্বকালের গানগুলি হয় দেবতার সম্মুখে নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত— সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল। সেইজন্য রচনার কোনো অংশেই অবহেলার লক্ষণ ছিল না, ভাব ভাষা ছন্দ রাগিণী সকলেরই মধ্যে সৌন্দর্য এবং নৈপুণ্য ছিল। তখন কবির রচনা করিবার এবং শ্রোতৃগণের শ্রবণ করিবার অব্যাহত অবসর ছিল; তখন গুণীসভায় গুণাকর কবির গুণপনা-প্রকাশ সার্থক হইত।

কিন্তু ইংরাজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস-আলোচনার অবসর যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতনসমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে আসরে অবতীর্ণ হইল। তাহারা পূর্ববর্তী গুণীদের গানে অনেক পরিমাণে জল এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে চটক মিশাইয়া, তাহাদের ছন্দোবন্ধ সৌন্দর্য সমস্ত ভাঙিয়া নিতান্ত সুলভ করিয়া দিয়া, অত্যন্ত লঘু সুরে উচ্চৈঃস্বরে চারিজোড়া ঢোল ও চারিখানা কাঁসি-সহযোগে সদলে সবলে চীৎকার করিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। কেবল গান শুনিবার এবং ভাবরস সম্ভোগ করিবার যে সুখ তাহাতেই তখনকার সভ্যগণ সন্তুষ্ট ছিলেন না—তাহার মধ্যে লড়াই এবং হার-জিতের উত্তেজনা থাকা আবশ্যক ছিল। সরস্বতীর বীণার তারেও ঝন্‌ঝন্ শব্দে ঝংকার দিতে হইবে আবার বীণার কাষ্ঠদণ্ড লইয়াও ঠক্ ঠক্ শব্দে লাঠি খেলিতে হইবে। নূতন হঠাৎ-রাজার মনোরঞ্জনার্থে এই এক অপূর্ব নূতন ব্যাপারের সৃষ্টি হইল। প্রথমে নিয়ম ছিল, দুই প্রতিপক্ষদল পূর্ব হইতে পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর লিখিয়া আনিতেন; অবশেষে তাহাতেও তৃপ্তি হইল না—আসরে বসিয়া মুখে মুখেই বাগ্‌যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এরূপ অবস্থায় যে কেবল প্রতিপক্ষকে আহত করা হয় তাহা নহে, ভাষা ভাব ছন্দ সমস্তই ছারখার হইতে থাকে। শ্রোতারাও বেশি কিছু প্রত্যাশা করে না—কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা এবং উপস্থিতমত জবাবেই সভা জমিয়া উঠে এবং বাহবা উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে; তাহার উপরে আবার চারজোড়া ঢোল, চারখানা কাঁসি

এবং সম্মিলিত কণ্ঠের প্রাণপণ চীৎকার; বিজনবিলাসিনী সরস্বতী এমন সভায় অধিকক্ষণ টিঁকিতে পারেন না।

সৌন্দর্যের সরলতায় যাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না, ভাবের গভীরতায় যাহাদের নিমগ্ন হইবার অবসর নাই, ঘন ঘন অনুপ্রাসে অতি শীঘ্রই তাহাদের মনকে উত্তেজিত করিয়া দেয়। সংগীত যখন বর্বর অবস্থায় থাকে তখন তাহাতে রাগরাগিণীর যতই অভাব থাক্, তালপ্রয়োগের খচমচ কোলাহল যথেষ্ট থাকে। সুরের অপেক্ষা সেই ঘন ঘন সশব্দ আঘাতে অশিক্ষিত চিত্ত সহজে মাতিয়া উঠে। এক শ্রেণীর কবিতায় অনুপ্রাস সেইরূপ ক্ষণিক, ত্বরিত, সহজ উত্তেজনার উদ্রেক করে। সাধারণ লোকের কর্ণ অতি শীঘ্র আকর্ষণ করিবার এমন সুলভ উপায় অল্পই আছে। অনুপ্রাস যখন ভাব ভাষা ও ছন্দের অনুগামী হয় তখন তাহাতে কাব্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে কিন্তু সে সকলকে ছাড়াইয়া ছাপাইয়া উঠিয়া যখন মূঢ় লোকের বাহবা লইবার জন্য অগ্রসর হয় তখন তদ্দ্বারা সমস্ত কবিতা ইতরতা প্রাপ্ত হয়।

কবিদলের গানে অনেক স্থলে অনুপ্রাস—ভাব, ভাষা, এমন-কি ব্যাকরণকে ঠেলিয়া ফেলিয়া শ্রোতাদের নিকট প্রগলভতা প্রকাশ করিতে অগ্রসর হয়। অথচ তাহার যথার্থ কোনো নৈপুণ্য নাই, কারণ তাহাকে ছন্দোবন্ধ অথবা কোনো নিয়ম রক্ষা করিয়াই চলিতে হয় না। কিন্তু যে শ্রোতা কেবল ক্ষণিক আমোদে মাতিয়া উঠিতে চাহে সে এত বিচার করে না; এবং যাহাতে বিচার আবশ্যক এমন জিনিসও চাহে না।

গেল গেল কুল কুল, যাক কুল—
তাহে নই আকুল।
লয়েছি যাহার কূল, সে আমার প্রতিকূল॥
যদি কুলকুণ্ডলিনী অনুকূলা হন আমায়
অকূলের তরী কূল পাব পুনরায়॥

এখন ব্যাকুল হয়ে কি দুকুল হারাব সই।
তাহে বিপক্ষ হাসিবে যত রিপুচয়॥

পাঠকেরা দেখিতেছেন, উপরি-উদ্‌ধৃত গীতাংশে এক কুল-শব্দের কূল পাওয়া দুষ্কর হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কোনো গুণপনা নাই; কারণ, উহার অধিকাংশই একই শব্দের পুনরাবৃত্তিমাত্র। কিন্তু শ্রোতৃগণের কোনো বিচার নাই, তাহারা অত্যন্ত সুলভ চাতুরীতে মুগ্ধ হইতে প্রস্তুত আছেন। এমন-কি, যদি অনুপ্রাস-ছটার খাতিরে কবি ব্যাকরণ এবং শব্দশাস্ত্র সম্পূর্ণ লঙ্ঘন করেন তাহাতেও কাহারো আপত্তি নাই। দৃষ্টান্ত—

একে নবীন বয়স, তাতে সুসভ্য,
কাব্যরসে রসিকে,
মাধুর্য গাম্ভীর্য, তাতে 'দাম্ভির্য' নাই,
আর আর বউ যেমনধারা ব্যাপিকে।
অধৈর্য হেরে তোরে স্বজনী, ধৈর্য ধরা নাহি যায়।
যদি সিদ্ধ হয় সেই কার্য করব সাহায্য,
বলি, তাই বলে যা আমায়॥

একে বাংলা শব্দের কোনো ভার নাই, ইংরাজি-প্রথা-মত তাহাতে অ্যাক্‌সেন্ট্‌ নাই, সংস্কৃত-প্রথা-মত তাহাতে হ্রস্ব-দীর্ঘ রক্ষা হয় না, তাহাতে আবার সমালোচ্য কবির গানে সুনিয়মিত ছন্দের বন্ধন না থাকাতে এই-সমস্ত অযত্নকৃত রচনাগুলিকে শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য ঘন ঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়। সোজা দেয়ালের উপর লতা উঠাইতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া তাহার অবলম্বন সৃষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও সেইরূপ ঘন ঘন শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া; অনেক নির্জীব রচনাও এই কৃত্রিম উপায়ে অতি দ্রুত বেগে মনোযোগ আচ্ছন্ন করিয়া বসে। বাংলা পাঁচালিতেও এই কারণেই এত অনুপ্রাসের ঘটা।

উপস্থিতমত সাধারণের মনোরঞ্জন করিবার ভার লইয়া কবিদলের গান—ছন্দ এবং ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন দিয়া কেবল সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুঁটা অলংকার লইয়া কাজ সারিয়া দিয়াছে, ভাবের কবিত্ব সম্বন্ধেও তাহার মধ্যে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। পূর্ববর্তী শাক্ত এবং বৈষ্ণব মহাজনদিগের ভাবগুলিকে অত্যন্ত তরল এবং ফিকা করিয়া কবিগণ শহরের শ্রোতাদিগকে সুলভ মূল্যে জোগাইয়াছেন। তাঁহাদের যাহা সংযত ছিল এখানে তাহা শিথিল এবং বিকীর্ণ। তাঁহাদের কুঞ্জবনে যাহা পুষ্প-আকারে প্রফুল্ল এখানে তাহা বাসি ব্যঞ্জন-আকারে সম্মিশ্রিত।

অনেক জিনিস আছে যাহাকে স্বস্থান হইতে বিচ্যুত করিলে তাহা বিকৃত এবং দূষণীয় হইয়া উঠে, কবির গানেও সেইরূপ অনেক ভাব তাহার যথাস্থান হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া কলুষিত হইয়া উঠিয়াছে। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে যে, বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর মধ্যে এমন অংশ আছে যাহা নির্মল নহে, কিন্তু সমগ্রের মধ্যে তাহা একপ্রকার শোভা পাইয়া গিয়াছে। কবিওয়ালা সেইটিকে তাহার সজীব আশ্রয় হইতে, তাহার সৌন্দর্য-পরিবেষ্টন হইতে, বিচ্ছিন্ন করিয়া ইতর ভাষা এবং শিথিল ছন্দ-সহযোগে স্বতন্ত্রভাবে আমাদের সম্মুখে ধরিলে তাহা গলিত পদার্থের ন্যায় কদর্য মূর্তি ধারণ করে।

বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে রাধার খণ্ডিতা অবস্থার বর্ণনা আছে। আধ্যাত্মিক অর্থে ইহার কোনো বিশেষ গৌরব থাকিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের এই কামুক ছলনার দ্বারা কৃষ্ণরাধার প্রেমকাব্যের সৌন্দর্যও খণ্ডিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাধিকার এই অবমাননায় কাব্যশ্রীও অবমানিত হইয়াছে।

কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্যরাশির মধ্যে এ-সকল বিকৃতি আমরা চোখ মেলিয়া দেখি না; সমগ্রের সৌন্দর্যপ্রভাবে তাহার দূষণীয়তা অনেকটা দূর হইয়া যায়। লৌকিক অর্থে ধরিতে গেলে বৈষ্ণব কাব্যে প্রেমের আদর্শ অনেক স্থলে স্খলিত

হইয়াছে ; তথাপি সমগ্র পাঠের পর যাহার মনে একটা সুন্দর এবং উন্নত ভাবের সৃষ্টি না হয়, সে হয় সমস্তটা ভালো করিয়া পড়ে নাই নয় সে যথার্থ কাব্যরসের রসিক নহে।

কিন্তু আমাদের কবিওয়ালারা বৈষ্ণব কাব্যের সৌন্দর্য এবং গভীরতা নিজেদের এবং শ্রোতাদের আয়ত্তের অতীত জানিয়া প্রধানত যে অংশ নির্বাচিত করিয়া লইয়াছেন তাহা অতি অযোগ্য। কলঙ্ক এবং ছলনা ইহাই কবিওয়ালাদের গানের প্রধান বিষয়। বারংবার রাধিকা এবং রাধিকার সখীগণ কুব্জাকে অথবা অপরাকে লক্ষ্য করিয়া তীব্র সরস পরিহাসে শ্যামকে গঞ্জনা করিতেছেন। তাঁহাদের আরো একটি রচনার বিষয় আছে, স্ত্রী-পক্ষ এবং পুরুষ-পক্ষের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস-প্রকাশ-পূর্বক দোষারোপ করা ; সেই শখের কলহ শুনিতে শুনিতে ধিক্‌কার জন্মে।

যাহাদের প্রকৃত আত্মসম্মানজ্ঞান দৃঢ় তাহারা সর্বদা অভিমান প্রকাশ করিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। তাহাদের মানে আঘাত লাগিলে, হয় তাহারা স্পষ্টরূপে তাহার প্রতিকার করে নয় তাহা নিঃশব্দে উপেক্ষা করিয়া যায়। প্রিয়জনদের নিকট হইতে প্রেমে আঘাত লাগিলে, হয় তাহা গোপনে বহন করে নয় সাক্ষাতভাবে সম্পূর্ণরূপে তাহার মীমাংসা করিয়া লয়। আমাদের দেশে ইহা সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় পরাধীনতা যাহার অবলম্বন সেই অভিমানী ; যে এক দিকে ভিক্ষুক তাহার অপর দিকে অভিমানের অন্ত নাই, যে সর্ববিষয়ে অক্ষম সে কথায় কথায় অভিমান প্রকাশ করিয়া থাকে। এই অভিমান জিনিসটি বাঙালি-প্রকৃতির মজ্জাগত নির্লজ্জ দুর্বলতার পরিচায়ক।

দুর্বলতা স্থলবিশেষে এবং পরিমাণবিশেষে সুন্দর লাগে। স্বল্প উপলক্ষে অভিমান কখনো কখনো স্ত্রীলোকদিগকে শোভা পায়। যতক্ষণ নায়কের প্রেমের প্রতি নায়িকার যথার্থ দাবি থাকে ততক্ষণ মাঝে মাঝে ক্রীড়াচ্ছলে

অথবা স্বল্প অপরাধের দণ্ডচ্ছলে পুরুষের প্রেমাবেগকে কিয়ৎকালের জন্য প্রতিহত করিলে সে অভিমানের একটা মাধুর্য দেখা যায়। কিন্তু গুরুতর অপরাধ অথবা বিশ্বাসঘাতের দ্বারা নায়ক যখন সেই প্রেমের মূলেই কুঠারাঘাত করে তখন যথারীতি অভিমান প্রকাশ করিতে বসিলে নিজের প্রতি একান্ত অবমাননা প্রকাশ করা হয় মাত্র; এইজন্য তাহাতে কোনো সৌন্দর্য নাই এবং তাহা কাব্যে স্থান পাইবার যোগ্য নহে।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে স্বামীকৃত সকল প্রকার অসম্মাননা এবং অন্যায় স্ত্রীকে অগত্যা সহ্য এবং মার্জনা করিতেই হয়; কিঞ্চিৎ অশ্রুজলসিক্ত বক্রবাক্য-বাণ অথবা কিয়ৎকাল অবগুণ্ঠনাবৃত বিমুখ মৌনাবস্থা ছাড়া আর কোনো অস্ত্র নাই, অতএব আমাদের সমাজে স্ত্রীলোকের সর্বদা অভিমান জিনিসটা সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা সর্বত্র সুন্দর নহে ইহাও নিশ্চয়; কারণ, যাহাতে কাহারো অবিমিশ্র স্থায়ী হীনতা প্রকাশ করে তাহা কখনোই সুন্দর হইতে পারে না।

কবিদলের গানে রাধিকার যে অভিমান প্রকাশ হইয়াছে তাহা প্রায়শই এইরূপ অযোগ্য অভিমান।—

সাধ ক'রে করেছিলেম দুর্জয় মান,
  শ্যামের তায় হল অপমান।
শ্যামকে সাধলেম না, ফিরে চাইলেম না,
  কথা কইলেম না রেখে মান।
কৃষ্ণ সেই রাগের অনুরাগে, রাগে রাগে গো
  পড়ে পাছে চন্দ্রাবলীর নবরাগে।
ছিল পূর্বের যে পূর্বরাগ, আবার এ কী অপূর্ব রাগ,
  পাছে রাগে শ্যাম রাধার আদর ভুলে যায়॥
যার মানের মানে আমায় মানে, সে না মানে

তবে কী করবে এ মানে।
মাধবের কত মান না হয় তার পরিমাণ,
মানিনী হয়েছি যার মানে॥
যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান
সেই পক্ষে রাখতে হয় সম্মান।
রাখতে শ্যামের মান গেল গেল মান,
আমার কিসের মান-অপমান॥

এই কয়েক ছত্রের মধ্যে প্রেমের যেটুকু ইতিহাস যে ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে কৃষ্ণের উপরেও শ্রদ্ধা হয় না, রাধিকার উপরেও শ্রদ্ধা হয় না, চন্দ্রাবলীর উপরেও অবজ্ঞার উদয় হয়।

কেবল নায়ক-নায়িকার অভিমান নহে, পিতামাতার প্রতি কন্যার অভিমানও কবিদলের গানে সর্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। গিরিরাজ-মহিষীর প্রতি উমার যে অভিমানকলহ তাহাতে পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক করে না— তাহা সর্বত্রই সুমিষ্ট বোধ হয়। তাহার কারণ, মাতৃস্নেহে উমার যথার্থ অধিকার সন্দেহ নাই; কন্যা ও মাতার মধ্যেএই-যে আঘাত ও প্রতিঘাত তাহাতে স্নেহসমুদ্র সুন্দরভাবে তরঙ্গিত হইয়া উঠে।

মাতা-কন্যা এবং নায়ক-নায়িকার মান-অভিমান যে কবিদলের গানের প্রধান বিষয়, পূর্বেই বলিয়াছি তাহার একটা কারণ বাঙালির প্রকৃতিতে অভিমানটা কিছু বেশি, অর্থাৎ অন্যের প্রেমের প্রতি স্বভাবতই তাহার দাবি অত্যন্ত অধিক; এমন-কি, সে প্রেম অপ্রমাণ হইয়া গেলেও ইনিয়া-বিনিয়া কাঁদিয়া-রাগিয়া আপনার দাবি সে কিছুতেই ছাড়ে না— আর-একটা কারণ, এই মান-অভিমানে উত্তর-প্রত্যুত্তরের তীব্রতা এবং জয়-পরাজয়ের উত্তেজনা রক্ষিত হয়। কবিওয়ালাদের গানে সাহিত্যরসের সৃষ্টি অপেক্ষা ক্ষণিক উত্তেজনা-উদ্রেকই প্রধান লক্ষ্য।

ধর্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসর-রঞ্জনের জন্য গান রচনা বর্তমান বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন। এখনো সাহিত্যের উপর সেই সাধারণেরই আধিপত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণের প্রকৃতি-পরিবর্তন হইয়াছে। এবং সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য গভীরতা লাভ করিয়াছে। তাহার সম্যক্‌ আলোচনা করিতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধের অবতারণা করিতে হয়, অতএব এক্ষণে তাহার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু সাধারণের যতই রুচির উৎকর্ষ ও শিক্ষার বিস্তার হউক-না কেন তাহাদের আনন্দ-বিধানের জন্য স্থায়ী সাহিত্য এবং আবশ্যক-সাধন ও অবসর-রঞ্জনের জন্য ক্ষণিক সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই থাকিবে। এখনকার দিনের খবরের কাগজ এবং নাট্যশালাগুলি শেষোক্ত প্রয়োজন সাধন করিতেছে। কবি-দলের গানে যে-প্রকার উচ্চ আদর্শের শৈথিল্য এবং সুলভ অলংকারের বাহুল্য দেখা গিয়াছে, আধুনিক সংবাদপত্রে এবং অভিনয়ার্থে রচিত নাটকগুলিতেও কথঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে তাহাই দেখা যায়। এই-সকল ক্ষণকালজাত ক্ষণ-স্থায়ী সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের ইতরতা, সত্য এবং সাহিত্যনীতির ব্যভিচার এবং সর্ববিষয়ে রূঢ়তা ও অসংযম দেখিতে পাওয়া যায়। অচিরকালেই সাধারণের এমন উন্নতি হইবে যে, তাহারা অবসর-বিনোদনের মধ্যেও ভদ্রোচিত সংযম, গভীরতর সত্য এবং দুরূহতর আদর্শের প্রতিষ্ঠা দেখিতে পাইবে তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।

আমরা সাধারণ এবং সমগ্রভাবে কবির দলের গানের সমালোচনা করিয়াছি। স্থানে স্থানে সে-সকল গানের মধ্যে সৌন্দর্য এবং ভাবের উচ্চতাও আছে; কিন্তু মোটের উপর এই গানগুলির মধ্যে ক্ষণস্থায়িত্ব, রসের জলীয়তা এবং কাব্যকলার প্রতি অবহেলাই লক্ষিত হয়—এবং সেরূপ হইবার প্রধান কারণ, এই গানগুলি ক্ষণিক উত্তেজনার জন্য উপস্থিতমত রচিত।

তথাপি এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ— এবং ইংরাজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।

১৩০২

গ্রাম্যসাহিত্য

একদিন শ্রাবণের শেষে নৌকা করিয়া পাবনা-রাজশাহির মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলাম। মাঠ ঘাট সমস্ত জলে ডুবিয়াছে। ছোটো ছোটো গ্রামগুলি জলচর জীবের ভাসমান কুলায়পুঞ্জের মতো মাঝে মাঝে জাগিয়া আছে। কূলের রেখা দেখা যায় না শুধু জল ছলছল করিতেছে; ইহার মধ্যে যখন সূর্য অস্ত যাইবে এমন সময় দেখা গেল প্রায় দশ-বারো জন লোক একখানি ডিঙি বাহিয়া আসিতেছে। তাহারা সকলে মিলিয়া উচ্চকণ্ঠে এক গান ধরিয়াছে এবং দাঁড়ের পরিবর্তে এক-একখানি বাঁখারি দুই হাতে ধরিয়া গানের তালে তালে ঝোঁকে ঝোঁকে ঝপ্ ঝপ্ শব্দে জল ঠেলিয়া দ্রুত বেগে চলিয়াছে; গানের কথাগুলি শুনিবার জন্য কান পাতিলাম, অবশেষে বারংবার আবৃত্তি শুনিয়া যে ধুয়াটি উদ্ধার করিলাম তাহা এই—

যুবতী, ক্যান্ বা কর মন ভারী।
পাবনা থ্যাহে আন্যে দেব ট্যাহা-দামের মোটরি॥

ভরা বর্ষার জলপ্লাবনের উপর যখন নিঃশব্দে সূর্য অস্ত যাইতেছে এ গানটি ঠিক তখনকার উপযুক্ত কি না সে সম্বন্ধে পাঠকমাত্রেরই সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু গানের এই দুটি চরণে সেই শৈবালকীর্ণ জলমরুর মাঝখান হইতে সমস্ত গ্রামগুলি যেন কথা কহিয়া উঠিল। দেখিলাম, এই গোয়াল-ঘরের পাশে, এই কুল গাছের ছায়ায়, এখানেও যুবতী মন ভারী করিয়া থাকেন এবং তাঁহার রোষারুণ কুটিলকটাক্ষপাতে গ্রাম্যকবির কবিতা ছন্দে-বন্ধে সুরে-তালে মাঠে-ঘাটে জলে-স্থলে জাগিয়া উঠিতে থাকে।

জগতে যতপ্রকার দুর্বিপাক আছে যুবতীচিত্তের বিমুখতা তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য— সেই দুর্গ্রহ-শান্তির জন্য কবিরা ছন্দোরচনা এবং প্রিয়প্রসাদ-বঞ্চিত হতভাগ্যগণ প্রাণপাত পর্যন্ত করিতে প্রস্তুত। কিন্তু যখন গানের মধ্যে শুনিলাম

'পাবনা থেকে আনি দিব টাকা-দামের মোটরি', তখন ক্ষণকালের জন্য মনের মধ্যে বড়ো একটা আশ্বাস অনুভব করা গেল। মোটরি পদার্থটি কী তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু তাহার মূল্য যে এক টাকার বেশি নহে কবি তাহাতে সন্দেহ রাখেন নাই। জগতের এক প্রান্তে পাবনা জিলায় যে এমন একটা স্থান আছে যেখানে প্রতিকূল প্রণয়িনীর জন্য অসাধ্যসাধন করিতে হয় না, পাবনা অপেক্ষা দুর্গম স্থানে যাইতে এবং 'মোটরি' অপেক্ষা দুর্লভ পদার্থ সংগ্রহ করিতে হয় না, ইহা মনে করিলে ভবযন্ত্রণা অপেক্ষাকৃত সুসহ বলিয়া বোধ হয়। কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর কবিরা এমন স্থলে নিশ্চয়ই মানস-সরোবরের স্বর্ণপদ্ম, আকাশের তারা এবং নন্দনকাননের পারিজাত অম্লানমুখে হাঁকিয়া বসিতেন। এবং উজ্জয়িনীর প্রথম শ্রেণীর যুবতীরা শিখরিণী ও মন্দাক্রান্তাচ্ছন্দে এমন দুঃসাধ্য অনুষ্ঠানের প্রস্তাবমাত্র শুনিলে প্রসন্ন না হইয়া থাকিতে পারিতেন না।

অন্তত কাব্য পড়িয়া এইরূপ ভ্রম হয়। কিন্তু অবিশ্বাসী গদ্যজীবী লোকেরা এতটা কবিত্ব বিশ্বাস করে না। শুদ্ধমাত্র মন্ত্রপাঠের দ্বারা এক পাল ভেড়া মারা যায় কি না এ প্রশ্নের উত্তরে ভল্‌টেয়ার বলিয়াছেন, যায়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আর্সেনিক বিষও থাকা চাই। মন-ভারী-করা যুবতীর পক্ষে আকাশের তারা, নন্দনের পারিজাত এবং প্রাণসমর্পণের প্রস্তাব সন্তোষজনক হইতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাজুবন্ধ বা চরণচক্রের প্রয়োজন হয়। কবি ঐ কথাটা চাপিয়া যান; তিনি প্রমাণ করিতে চান যে কেবল মন্ত্রবলে, কেবল ছন্দ এবং ভাবের জোরেই কাজ সিদ্ধ হয়—অলংকারের প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু তাহা কাব্যালংকারের। এ দিকে আমাদের পাবনার জনপদবাসিনীরা কাব্যের আড়ম্বর বাহুল্য জ্ঞান করেন, এবং তাঁহাদের চিরানুরক্ত গ্রামবাসী কবি মন্ত্রতন্ত্র বাদ দিয়া একেবারেই সোজা টাকা-দামের মোটরির কথাটা পাড়িয়া বসেন; সময় নষ্ট করেন না।

তবুও একটা ছন্দ এবং একটা সুর চাই। এই জগৎপ্রান্তে এই পাবনা জিলার বিলের ধারেও তাহার প্রয়োজন আছে। তাহাতে করিয়া ঐ মোটরির দাম এক টাকার চেয়ে অনেকটা বাড়িয়া যায়। ঐ মোটরিটাকে রসের এবং ভাবের পরশ-পাথর ছোঁওয়াইয়া দেওয়া হয়। গানের সেই দুটো লাইনকে প্রচলিত গদ্যে বিনা সুরে বলিলে তাহার মধ্যে যে-একটি রূঢ় দৈন্য আসিয়া পড়ে, ছন্দে সুরে তাহা নিমেষের মধ্যে ঘুচিয়া যায়; সংসারের প্রতিদিনের ধূলিস্পর্শ হইতে ঐ ক'টি তুচ্ছ কথা ভাবের আবরণে আবৃত হইয়া উঠে।

মানুষের পক্ষে ইহার একটা একান্ত প্রয়োজন আছে। যে-সকল সাংসারিক ব্যাপারের দ্বারা সে সর্বদা ঘনিষ্ঠভাবে পরিবৃত তাহাকে সে ছন্দে লয়ে মণ্ডিত করিয়া তাহার উপর নিত্যসৌন্দর্যময় ভাবের রশ্মিপাত করিয়া দেখিতে চায়।

সেইজন্য জনপদে যেমন চাষবাস এবং খেয়া চলিতেছে— সেখানে কামারের ঘরে লাঙলের ফলা, ছুতারের ঘরে ঢেঁকি এবং স্বর্ণকারের ঘরে টাকা-দামের মোটরি নির্মাণ হইতেছে— তেমনি সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে ভিতরে একটা সাহিত্যের গঠনকার্যও চলিতেছে; তাহার বিশ্রাম নাই। প্রতিদিন যাহা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবে সম্পন্ন হইতেছে সাহিত্য তাহাকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিয়া নিত্যকালের জন্য প্রস্তুত করিতে চেষ্টা করিতেছে। গ্রামের মধ্যে প্রতি-দিনের বিচিত্র কাজও চলিতেছে এবং তাহার ছিদ্রে ছিদ্রে চিরদিনের একটা রাগিণী বাজিয়া উঠিবার জন্য নিয়ত প্রয়াস পাইতেছে।

পদ্মা বাহিয়া চলিতে চলিতে বালুচরের মধ্যে যখন চকাচকীর কলরব শুনা যায় তখন তাহাকে কোকিলের কুহুতান বলিয়া কাহারো ভ্রম হয় না, তাহাতে পঞ্চম মধ্যম কড়িকোমল কোনোপ্রকার সুর ঠিকমত লাগে না ইহা নিশ্চয়, কিন্তু তবু ইহাকে পদ্মাচরের গান বলিলে কিছুই অসংগত হয় না। কারণ, ইহাতে সুর বেসুর যাহাই লাগুক, সেই নির্মল নদীর হাওয়ায় শীতের রৌদ্রে অসংখ্য প্রাণীর জীবনসুখসম্ভোগের আনন্দধ্বনি বাজিয়া উঠে।

গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক্ বা না-থাক্ সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে। পদ্মাচরের চক্রবাক-সংগীতের মতো তাহা নিখুঁত সুর-তালের অপেক্ষা রাখে না। মেঘদূতের কবি অলকা পর্যন্ত গিয়াছেন, তিনি উজ্জয়িনীর রাজসভার কবি। আমাদের অখ্যাত গানের কবি কঠিন দায়ে পড়িয়াও পাবনা শহরের বেশি অগ্রসর হইতে পারে নাই; যদি পারিত তবে তাহার গ্রামের লোক তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিত। কল্পনার সংকীর্ণতার দ্বারাই সে আপন প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে, কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেইজন্য বাংলা জনপদের মধ্যে ছড়া গান কথা-আকারে যে সাহিত্য গ্রামবাসীর মনকে সকল সময়েই দোল দিতেছে তাহাকে কাব্যহিসাবে গ্রহণ করিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে সমস্ত গ্রাম, সমস্ত লোকালয়কে জড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতে হয়; তাহারাই ইহার ভাঙা ছন্দ এবং অপূর্ণ মিলকে অর্থে ও প্রাণে ভরাট করিয়া তোলে। গ্রাম্যসাহিত্য বাংলার গ্রামের ছবির, গ্রামের স্মৃতির অপেক্ষা রাখে; সেইজন্যই বাঙালির কাছে ইহার একটি বিশেষ রস আসে। বৈষ্ণবী যখন 'জয় 'রাধে' বলিয়া ভিক্ষা করিতে অন্তঃপুরের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়ায় তখন কুতূহলী গৃহকর্ত্রী এবং অবগুণ্ঠিত বধূগণ তাহা শুনিবার জন্য উৎসুক হইয়া আসেন। প্রবীণা পিতামহী, গল্পে গানে ছড়ায় যিনি আকণ্ঠ পরিপূর্ণ—কত শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্নায় ও কৃষ্ণপক্ষের তারার আলোকে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিয়া তুলিয়া গৃহের বালকবালিকা যুবকযুবতী একাগ্রমনে বহু শত বৎসর ধরিয়া যাহা শুনিয়া আসিতেছে বাঙালি পাঠকের নিকট তাহার রস গভীর এবং অক্ষয়।

গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে; তাহা বিশেষরূপে সংকীর্ণরূপে দেশীয়, স্থানীয়। তাহা কেবল দেশের জনসাধারণেরই উপভোগ্য ও আয়ত্তগম্য; সেখানে বাহিরের লোক প্রবেশের অধিকার পায় না। সাহিত্যের যে অংশ সার্বভৌমিক তাহা এই প্রাদেশিক নিম্নস্তরের থাকটার উপরে দাঁড়াইয়া আছে। এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর ভিতরকার একটি যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল-ফল ডালপালার সঙ্গে মাটির নীচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না; তবু তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।

নীচের সহিত উপরের এই-যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা-ধনীসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প; কিন্তু অন্নদামঙ্গল কুমার-সম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌরী। কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম-রচিত কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্যে ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না।

আমার হাতে যে ছড়াগুলি সঞ্চিত হইয়াছে তাহা অপেক্ষাকৃত পুরাতন কি নূতন নিঃসন্দেহ বলিতে পারি না। কিন্তু দুই-এক শত বৎসরে এ-সকল কবিতার বয়সের কম-বেশি হয় না। আজ পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে পল্লীর কবি

যে ছড়া রচনা করিয়াছে তাহাকে এক হিসাবে মুকুন্দরামের সমসাময়িক বলা যায়; কারণ, গ্রামের প্রাণটি যেখানে ঢাকা থাকে কালস্রোতের ঢেউগুলি সেখানে তেমন জোরের সঙ্গে ঘা দিতে পারে না। গ্রামের জীবনযাত্রা এবং সেই জীবনযাত্রার সঙ্গী সাহিত্য, বহুকাল বিনা পরিবর্তনে একই ধারায় চলিয়া আসে।

কেবল সম্প্রতি অতি অল্পদিন হইল 'আধুনিক কাল' দূরদেশাগত নবীন জামাতার মতো নূতন চাল-চলন লইয়া পল্লীর অন্তঃপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। গ্রামের মধ্যেও পরিবর্তনের হাত পড়িয়াছে। এজন্য গ্রাম্য ছড়া-সংগ্রহের ভার যাঁহারা লইয়াছেন তাঁহারা আমাকে লিখিতেছেন—

'প্রাচীনা ভিন্ন আজকালকার মেয়েদের কাছে এইরূপ কবিতা শুনিবার প্রত্যাশা নাই। তাহারা ইহা জানে না এবং জানিবার কৌতূহলও রাখে না। বর্ষীয়সী স্ত্রীলোকের সংখ্যা খুব কম। তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে উহা জানেন না। দুই-একজন জানিলেও সকলে জানেন না। সুতরাং পাঁচটি ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলেই পাঁচ গ্রামের পাঁচজন বৃদ্ধার আশ্রয় লইতে হয়। এ দেশের পুরাতন বৈষ্ণবীগণের দুই-একজন মাঝে মাঝে এইরূপ কবিতা বলিয়া ভিক্ষা করে দেখিতে পাই। তাহাদের কথিত ছড়াগুলির সমস্তই রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক। এইরূপ বৈষ্ণবী সচরাচর মেলে না এবং মিলিলেও অনেকেই একবিধ ছড়াই গাহিয়া থাকে। এমন স্থলে একাধিক নূতন ছড়া সংগ্রহ করিতে হইলে অপেক্ষাকৃত বহু বৈষ্ণবীর সাহায্য আবশ্যক। তবে শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির কৃপায় প্রতি সপ্তাহে অন্তত দু-একটি বিদেশিনী নূতন বৈষ্ণবীর 'জয় রাধে' রব শুনিতে পাওয়া বড়ো কিছু আশ্চর্যের বিষয় নহে।

পূর্বে গ্রাম্য ছড়াগুলি গ্রামের সম্ভ্রান্ত বংশের মেয়েদেরও সাহিত্যরস-তৃষ্ণা মিটাইবার জন্য ভিখারিনী ও পিতামহীদের মুখে মুখে ঘরে ঘরে প্রচারিত হইত। এখন তাঁহারা অনেকেই পড়িতে শিখিয়াছেন; বাংলার ছাপাখানার সাহিত্য

তাঁহাদের হাতে পড়িয়াছে। এখন গ্রাম্য ছড়াগুলি বোধ করি সমাজের অনেক নীচের স্তরে নামিয়া গেছে।

ছড়াগুলির বিষয়কে মোটামুটি দুই ভাগ করা যায়। হরগৌরী-বিষয়ক এবং কৃষ্ণরাধা-বিষয়ক। হরগৌরী বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা বিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। এক দিকে সামাজিক দাম্পত্যবন্ধন, আর-এক দিকে সমাজবন্ধনের অতীত প্রেম।

দাম্পত্যসম্বন্ধের মধ্যে একটা বিঘ্ন বিরাজ করিতেছে, দারিদ্র্য। সেই দারিদ্র্যশৈলটাকে বেষ্টন করিয়া হরগৌরীর কাহিনী নানা দিক হইতে তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে। কখনো-বা শ্বশুর-শাশুড়ির স্নেহ সেই দারিদ্র্যকে আঘাত করিতেছে, কখনো-বা স্ত্রী-পুরুষের প্রেম সেই দারিদ্র্যের উপর আসিয়া প্রতিহত হইতেছে।

বাংলার কবিহৃদয় এই দারিদ্র্যকে মহত্ত্বে এবং দেবত্বে মহোচ্চ করিয়া তুলিয়াছে। বৈরাগ্য এবং আত্মবিস্মৃতির দ্বারা দারিদ্র্যের হীনতা ঘুচাইয়া কবি তাহাকে ঐশ্বর্যের অপেক্ষা অনেক বড়ো করিয়া দেখাইয়াছেন। ভোলানাথ দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন; দরিদ্রসমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় আদর্শ আর কিছুই নাই। 'আমার সম্বল নাই' যে বলে সেই গরিব; 'আমার আবশ্যক নাই' যে বলিতে পারে তাহার অভাব কিসের? শিব তো তাহারই আদর্শ।

অন্য দেশের ন্যায় ধনের সম্ভ্রম ভারতবর্ষে নাই, অন্তত পূর্বে ছিল না। যে বংশে বা গৃহে কুলশীলসম্মান আছে সে বংশে বা গৃহে ধন নাই এমন সম্ভাবনা আমাদের দেশে বিরল নহে। এইজন্য আমাদের দেশে ধনী ও নির্ধনের মধ্যে বিবাহের আদান-প্রদান সর্বদাই চলিয়া থাকে।

কিন্তু সামাজিক আদর্শ যেমনই হউক, ধনের একটা স্বাভাবিক মত্ততা আছে। ধনগৌরবে দরিদ্রের প্রতি ধনী কৃপাকটাক্ষপাত করিয়া থাকে। যেখানে

সামাজিক উচ্চনীচতা নাই সেখানে ধনের উচ্চনীচতা আসিয়া একটা বিপ্লব বাধাইয়া দেয়; এইরূপ অবস্থা দাম্পত্য-সম্বন্ধে একটা মস্ত বিপাকের কারণ। স্বভাবতই ধনী শ্বশুর যখন দরিদ্র জামাতাকে অবজ্ঞা করে এবং ধনীকন্যা দরিদ্র পতি ও নিজের দুরদৃষ্টের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠেন তখন গৃহধর্ম কম্পান্বিত হইয়া থাকে।

দাম্পত্যের এই দুর্গ্রহ কেমন করিয়া কমিয়া যায় হরগৌরীর কাহিনীতে তাহা কীর্তিত হইয়াছে। সতী স্ত্রীর অটল শ্রদ্ধা তাহার একটা উপাদান, তাহার আর-একটা উপাদান দারিদ্র্যের হীনতামোচন, মহত্ত্ব-কীর্তন। উমাপতি দরিদ্র হইলেও হেয় নহেন, এবং শ্মশানচারীর স্ত্রী পতিগৌরবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

দাম্পত্যবন্ধনের আর-একটি মহৎ বিঘ্ন স্বামীর বার্ধক্য ও কুরূপতা। হর-গৌরীর সম্বন্ধে তাহাও পরাভূত হইয়াছে। বিবাহসভায় বৃদ্ধ জামাতাকে দেখিয়া মেনকা যখন আক্ষেপ করিতেছেন তখন অলৌকিক প্রভাবে বৃদ্ধের রূপ-যৌবন বসনভূষণ প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এই অলৌকিক রূপযৌবন প্রত্যেক বৃদ্ধ স্বামীরই আছে, তাহা তাহার স্ত্রীর আন্তরিক ভক্তি-প্রীতির উপর নির্ভর করে। গ্রামের ভিক্ষুক কথক গায়ক হরগৌরীর কথায় বারে বারে দ্বারে দ্বারে সেই ভক্তি উদ্রেক করিয়া বেড়ায়।

গ্রামের কবিপ্রতিভা এইখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। শিবকে গাঁজা ভাঙ প্রভৃতি নেশায় উন্মত্ত করিয়াছে। শুদ্ধ তাহাই নহে; অসভ্য কোঁচকামিনীদের প্রতি তাঁহার আসক্তি প্রচার করিতে ছাড়ে নাই। কালিদাসের অনুত্তরঙ্গ সমুদ্র ও নির্বাতনিষ্কম্প দীপশিখাবৎ যোগীশ্বর বাংলার পল্লীতে আসিয়া এমনি দুর্গতি-প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কিন্তু স্থূল কথা এই যে, হরগৌরীর কথা ছোটো-বড়ো সমস্ত বিঘ্নের উপরে দাম্পত্যের বিজয়কাহিনী। হরগৌরীপ্রসঙ্গে আমাদের একান্ন-পারিবারিক

সমাজের মর্মরূপিণী রমণীর এক সজীব আদর্শে গঠিত হইয়াছে। স্বামী দীন দরিদ্র বৃদ্ধ বিরূপ যেমনই হউক, স্ত্রী রূপযৌবন-ভক্তিপ্রীতি-ক্ষমাধৈর্য-তেজগর্বে সমুজ্জ্বলা। স্ত্রীই দরিদ্রের ধন, ভিখারির অন্নপূর্ণা, রিক্ত গৃহের সম্মানলক্ষ্মী।

হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান। ইহার মধ্যে যে অধ্যাত্মতত্ত্ব আছে তাহা আমরা ছাড়িয়া দিতেছি। কারণ, তত্ত্ব যখন রূপকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে তখন তো সে আপন তত্ত্বরূপ গোপন করে। বাহ্যরূপেই সে সাধারণের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া থাকে। রাধাকৃষ্ণের রূপকের মধ্যে এমন একটি পদার্থ আছে যাহা বাংলার বৈষ্ণব অবৈষ্ণব তত্ত্বজ্ঞানী ও মূঢ় সকলেরই পক্ষে উপাদেয়, এইজন্যই তাহা ছড়ায় গানে যাত্রায় কথকতায় পরিব্যাপ্ত হইতে পারিয়াছে।

সৌন্দর্যসূত্রে নরনারীর প্রেমের আকর্ষণ সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচারিত। কেবল সামাজিক কর্তব্যবন্ধনে ইহাকে সম্পূর্ণ কুলাইয়া পায় না। সমাজের বাহিরেও ইহার শাসন বিস্তৃত। পঞ্চশরের গতিবিধি সর্বত্রই, এবং বসন্ত অর্থাৎ জগতের যৌবন এবং সৌন্দর্য তাঁহার নিত্য-সহচর।

নরনারীর প্রেমের এই যে একটি মোহিনী শক্তি আছে, যে শক্তিবলে সে মুহূর্তের মধ্যে জগতের সমস্ত চন্দ্রসূর্যতারা পুষ্পকানন নদনদীকে এক সূত্রে টানিয়া মধুরভাবে উজ্জ্বলভাবে আপনার চতুর্দিকে সাজাইয়া আনে, যে প্রেমের শক্তি আকস্মিক অনির্বচনীয় আবির্ভাবের দ্বারা এতদিনকার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উপেক্ষিত বিশ্বজগৎকে চক্ষের পলকে সম্পূর্ণরূপে কৃতকৃতার্থ করিয়া তোলে— সেই শক্তিকে যুগে যুগে দেশে দেশে মনুষ্য অধ্যাত্মশক্তির রূপক বলিয়া অনুভব ও বর্ণনা করিয়াছে। তাহার প্রমাণ সলোমন, হাফেজ এবং বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী। দুটি মনুষ্যের প্রেমের মধ্যে এমন একটি বিরাট বিশ্বব্যাপকতা আছে যে আধ্যাত্মিক ভাবুকদের মনে হয়, সেই প্রেমের সম্পূর্ণ অর্থ সেই দুইটি মনুষ্যের

মধ্যেই পর্যাপ্ত নহে; তাহা ইঙ্গিতে জগৎ ও জগদীশ্বরের মধ্যবর্তী অনন্তকালের সম্বন্ধ ও অপরিসীম ব্যাকুলতা জ্ঞাপন করিতেছে।

কাব্যের পক্ষে এমন সামগ্রী আর দ্বিতীয় নাই। ইহা একই কালে সুন্দর এবং বিরাট, অন্তরতম এবং বিশ্বগ্রাসী; লৌকিক এবং অনির্বচনীয়। যদিচ স্ত্রীপুরুষের প্রকাশ্য মেলামেশা ও স্বাধীন বরণের অভাবে ভারতবর্ষীয় সমাজে এই প্রেম লাঞ্ছিত হইয়া গুপ্তভাবে বিরাজ করে, তথাপি ভারতবর্ষের কবিরা নানা ছলে নানা কৌশলে ইহাকে তাঁহাদের কাব্যে আবাহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে সমাজের অবমাননা না করিয়া কাব্যকে সমাজের বাহিরে স্থাপন করিয়াছেন। মালিনীনদীতীরে তপোবনে, সহকারসনাথ-বনজ্যোৎস্না-কুঞ্জে, নবযৌবনা শকুন্তলা সমাজ-কারাবাসী কবিহৃদয়ের কল্পনাস্বপ্ন। দুষ্মন্ত-শকুন্তলার প্রেম সমাজের অতীত, এমন-কি, তাহা সমাজবিরোধী। পুরূরবার প্রেমোন্মত্ততা সমাজবন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া নদী-গিরি-বনের মধ্যে মদমত্ত বন্য হস্তীর মতো উদ্দামভাবে পরিভ্রমণ করিয়াছে। মেঘদূত বিরহের কাব্য। বিরহাবস্থায় দৃঢ়বদ্ধ দাম্পত্যসূত্রে কিঞ্চিৎ ব্যবচ্ছেদ ঘটিয়া মানব যেন পুনশ্চ স্বতন্ত্র-ভাবে ভালোবাসিবার অবসর লাভ করে। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে সেই ব্যবধান পড়ে যেখানে হৃদয়ের প্রবল অভিমুখী গতি আপনাকে স্বাধীনভাবে প্রবাহিত করিতে স্থান পায়। কুমারসম্ভবে কুমারী গৌরী যদি প্রচলিত সমাজনিয়মের বিরুদ্ধে শৈলতপোবনে একাকিনী মহাদেবের সেবা না করিতেন তবে তৃতীয় সর্গের ন্যায় অমন অতুলনীয় কাব্যের সৃষ্টি হইত কী করিয়া? এক দিকে বসন্তপুষ্পাভরণা শিরীষপেলবা বেপথুমতী উমা, অন্যদিকে যোগাসীন মহাদেবের অগাধস্তম্ভিত সমুদ্রবিশাল হৃদয়— লোকালয়ের নিয়মপ্রাচীরের মধ্যে বিশ্ববিজয়ী প্রেমের এমন সুযোগ মিলিত কোথায়?

যাহা হউক, মানবরচিত সমাজ আপনার মধ্যে আপনি সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত নয়। যে শক্তি সমাজকে সমাজের বাহিরের দিকে টানে সেই সৌন্দর্য সেই প্রেমের

শক্তিকে অন্তত মানসলোকে স্থাপন করিয়া কল্পনার দ্বারা উপভোগ না করিয়া মানুষ থাকিতে পারে না। পার্থিব সমাজে যদি-বা বাধা পায় তবে দ্বিগুণ তীব্রতার সহিত আধ্যাত্মিক ভাবের মধ্যে তাহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করে। বৈষ্ণবের গান যে দেখিতে দেখিতে সমস্ত ভারতবর্ষ ছাইয়া ফেলিয়াছে ইহাই তাহার প্রধান কারণ। বৈষ্ণবের গান স্বাধীনতার গান। তাহা জাতি মানে না, কুল মানে না। অথচ এই উচ্ছৃঙ্খলতা সৌন্দর্যবন্ধনে হৃদয়বন্ধনে নিয়মিত। তাহা অন্ধ ইন্দ্রিয়ের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ততা মাত্র নহে।

হরগৌরীকথায় দাম্পত্যবন্ধনে যেমন কতকগুলি বাধা বর্ণিত হইয়াছে, বৈষ্ণব গাথার প্রেমপ্রবাহেও তেমনি একমাত্র প্রবল বাধার উল্লেখ আছে, তাহা সমাজ। তাহা একাই এক সহস্র। বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই সমাজ-বাধার চতুর্দিকে প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। এমন-কি, বৈষ্ণব কাব্য-শাস্ত্রে পরকীয়া অনুরক্তির বিশেষ গৌরব বর্ণিত হইয়াছে। সে গৌরব সমাজ-নীতির হিসাবে নহে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তাহা নিছক প্রেমের হিসাবে। ইহাতে যে আত্ম-বিস্মৃতি, বিশ্ববিস্মৃতি, নিন্দা ভয় লজ্জা শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য, কঠিন কুলাচার লোকাচারের প্রতি অচেতনতা প্রকাশ পায় তদ্দ্বারা প্রেমে প্রচণ্ড বল, দুর্বোধ রহস্য, তাহার বন্ধনবিহীনতা, সমাজ-সংসার স্থান-কাল-পাত্র এবং যুক্তিতর্ক কার্য-কারণের অতীত একটা বিরাট ভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এই কারণে যাহা বিশ্বসমাজে সর্বত্রই এক বাক্যে নিন্দিত সেই অভ্রভেদী কলঙ্কচূড়ার উপরে বৈষ্ণব কবিগণ তাঁহাদের বর্ণিত প্রেমকে স্থাপন করিয়া তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। এই সর্বনাশী, সর্বত্যাগী, সর্ববন্ধনচ্ছেদী প্রেমকে আধ্যাত্মিক অর্থে গ্রহণ করিতে না পারিলে কাব্য হিসাবে ক্ষতি হয় না, সমাজ-নীতি হিসাবে হইবার কথা।

এইরূপ প্রেমগানের প্রচার সাধারণ লোকের পক্ষে বিপজ্জনক এবং সমাজের পক্ষে অহিতকর মনে হইতে পারে। কিন্তু ফলত তাহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

মানবপ্রকৃতিকে সমাজ একেবারে উন্মূলিত করিতে পারে না। তাহা কাজে কথায় কল্পনায় আপনাকে নানাপ্রকারে ব্যক্ত করিয়া তোলে। তাহা এক দিক হইতে প্রতিহত হইয়া আর-এক দিক দিয়া প্রবাহিত হয়। মানবপ্রকৃতিকে অযথাপরিমাণে এবং সম্পূর্ণভাবে রোধ করাতেই সমাজের বিপদ। সে অবস্থায় যখন সেই রুদ্ধ প্রকৃতি কোনো-একটা আকারে বাহির হইবার পথ পায় তখনই বরঞ্চ বিপদের কতকটা লাঘব হয়। আমাদের দেশে যখন বন্ধবিহীন প্রেমের সমাজবিহিত প্রকাশ্য স্থান কোথাও নাই, সদর দরজা যখন তাহার পক্ষে একেবারেই বন্ধ, অথচ তাহাকে শাস্ত্র চাপা দিয়া গোর দিলেও সে যখন ভূত হইয়া মধ্যাহ্নরাত্রে রুদ্ধদ্বারের ছিদ্রমধ্য দিয়া দ্বিগুণতর বলে লোকালয়ে পর্যটন করিয়া বেড়ায়, তখন বিশেষরূপে আমাদের সমাজেই সেই কুলমানগ্রাসী কলঙ্ক-অঙ্কিত প্রেম স্বাভাবিক নিয়মে গুপ্তভাবে স্থান পাইতে বাধ্য; বৈষ্ণব কবিরা সেই বন্ধননাশী প্রেমের গভীর দুর্নিবার আবেগকে সৌন্দর্যক্ষেত্রে অধ্যাত্মলোকে বহমান করিয়া তাহাকে অনেক পরিমাণে সংসারপথ হইতে মানসপথে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছেন, আমাদের সমাজের সেই চিরক্ষুধাতুর প্রেতটাকে পবিত্র গয়ায় পিণ্ডদান করিবার আয়োজন করিয়াছেন। তাঁহারা কামকে প্রেমে পরিণত করিবার জন্য ছন্দোবদ্ধ কল্পনার বিবিধ পরশপাথর প্রয়োগ করিয়াছেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যে যে ইন্দ্রিয়বিকার কোথাও স্থান পায় নাই তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু বৃহৎ স্রোতস্বিনী নদীতে যেমন অসংখ্য দূষিত ও মৃত পদার্থ প্রতিনিয়ত আপনাকে আপনি সংশোধন করে তেমনি সৌন্দর্য এবং ভাবের বেগে সেই-সমস্ত বিকার সহজেই শোধিত হইয়া চলিয়াছে। বরঞ্চ বিদ্যাসুন্দরের কবি সমাজের বিরুদ্ধে যথার্থ অপরাধী। সমাজের প্রাসাদের নীচে তিনি হাসিয়া হাসিয়া সুরঙ্গ খনন করিয়াছেন। সে সুরঙ্গ-মধ্যে পূতসূর্যালোক এবং উন্মুক্ত বায়ুর প্রবেশপথ নাই। তথাপি এই বিদ্যাসুন্দর কাব্যের এবং বিদ্যাসুন্দর যাত্রার এত আদর আমাদের দেশে কেন? উহা অত্যাচারী কঠিন সমাজের প্রতি

মানবপ্রকৃতির সুনিপুণ পরিহাস। বৈষ্ণব কবি যে জিনিসটাকে ভাবের ছায়াপথে সুন্দররূপে অঙ্কিত করিয়াছেন ইনি সেইটাকে সমাজের পিঠের উপরে দাগার মতো ছাপিয়া দিয়াছেন; যে দেখিতেছে সেই কৌতুক অনুভব করিতেছে।

যাহা হউক, মোটের উপর হরগৌরী এবং কৃষ্ণরাধাকে লইয়া আমাদের গ্রাম্যসাহিত্য রচিত। তাহার মধ্যে হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। সেই হরগৌরীর কথায় আমাদের বাংলাদেশের একটা বড়ো মর্মের কথা আছে। কন্যা আমাদের গৃহের এক মস্ত ভার; কন্যাদায়ের মতো দায় নাই। কন্যা-পিতৃত্বং খলু নাম কষ্টম্। সমাজের অনুশাসনে নির্দিষ্ট বয়স এবং সংকীর্ণ মণ্ডলীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে আমরা বাধ্য। সুতরাং সেই কৃত্রিম তাড়নাবশতই বরের দর অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তাহার রূপগুণ অর্থসামর্থ্যে আর তত প্রয়োজন থাকে না। কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পণ করা, ইহা আমাদের সমাজে নিত্য-নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, অশ্রুপাত, জামাতৃপরিবারের সহিত বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুলের মধ্যবর্তিনী বালিকার নিষ্ঠুর মর্মবেদনা, সর্বদাই ঘরে ঘরে উদ্‌ভূত হইয়া থাকে। একান্নপরিবারে আমরা দূর ও নিকট, এমন-কি, নামমাত্র আত্মীয়কেও বাঁধিয়া রাখিতে চাই; কেবল কন্যাকেই ফেলিয়া দিতে হয়। যে সমাজে স্বামী-স্ত্রী ব্যতীত পুত্রকন্যা প্রভৃতি সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় তাহারা আমাদের এই দুঃসহ বেদনা কল্পনা করিতে পারিবে না। আমাদের মিলনধর্মী পরিবারে এই একমাত্র বিচ্ছেদ। সুতরাং ঘুরিয়া ফিরিয়া সর্বদাই সেই ক্ষতবেদনায় হাত পড়ে। হরগৌরীর কথা বাংলার একান্ন-পরিবারের সেই প্রধান বেদনার কথা। শরৎসপ্তমীর দিনে সমস্ত বঙ্গভূমির ভিখারি-বধূ কন্যা মাতৃগৃহে আগমন করে, এবং বিজয়ার দিনে সেই ভিখারি-ঘরের অন্নপূর্ণা যখন স্বামীগৃহে ফিরিয়া যায় তখন সমস্ত বাংলাদেশের চোখে জল ভরিয়া আসে।

এই-সকল কারণে হরগৌরীসম্বন্ধীয় গ্রাম্যছড়াগুলি বাস্তব ভাবের। তাহা

রচয়িতা ও শ্রোতৃবর্গের একান্ত নিজের কথা। সেই-সকল কাব্যে জামাতার নিন্দা, স্ত্রীপুরুষের কলহ ও গৃহস্থালীর বর্ণনা যাহা আছে তাহাতে রাজভাব বা দেবভাব কিছুই নাই; তাহাতে বাংলাদেশের গ্রাম্য কুটিরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানা-পুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আম-বাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাঁহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টামাত্র করিতেন তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।

শরৎকালে রানী বলে বিনয়বচন—
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন?

এই স্বপ্ন হইতে কথা আরম্ভ। সমস্ত আগমনী গানের এই ভূমিকা। প্রতি বৎসর শরৎকালে ভোরের বাতাস যখন শিশিরসিক্ত এবং রৌদ্রের রঙ কাঁচা সোনার মতো হইয়া আসে, তখন গিরিরানী সহসা একদিন তাঁহার শ্মশানবাসিনী সোনার গৌরীকে স্বপ্ন দেখেন, আর বলেন—

আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন?

এ স্বপ্ন গিরিরাজ আমাদের পিতামহ এবং প্রপিতামহদের সময় হইতে ললিত বিভাস এবং রামকেলি রাগিণীতে শুনিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রত্যেক বৎসরই তিনি নূতন করিয়া শোনেন। ইতিবৃত্তের কোন্ বৎসরে জানি না, হরগৌরীর বিবাহের পরে প্রথম যে শরতে মেনকারানী স্বপ্ন দেখিয়া প্রত্যুষে জাগিয়া উঠিয়াছিলেন সেই প্রথম শরৎ সেই তাহার প্রথম স্বপ্ন লইয়াই বর্ষে বর্ষে ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। জলে স্থলে আকাশে একটি বৃহৎ বেদনা বাজিয়া উঠে, যাহাকে পরের হাতে দিয়াছি আমার সেই আপনার ধন কোথায়!

বৎসর গত হয়েছে কত, করছে শিবের ঘর।
যাও গিরিরাজ, আনতে গৌরী কৈলাসশিখর॥

বলা বাহুল্য, গিরিরাজ নিতান্ত লঘু লোকটা নহেন। চলিতে ফিরিতে, এমন-কি, শোক দুঃখ চিন্তা অনুভব করিতে তাঁহার স্বভাবতই কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিয়া থাকে। তাঁহার সেই সর্বাঙ্গীণ জড়তা ও ঔদাসীন্যের জন্য একবার গৃহিণীর নিকট গোটা-কয়েক তীব্র তিরস্কার-বাক্য শুনিয়া তবে তিনি অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় গাত্রোত্থান করিলেন।

শুনে কথা গিরিরাজা লজ্জায় কাতর
পঞ্চমীতে যাত্রা করে শাস্ত্রের বিচার।
তা শুনি মেনকারানী শীঘ্রগতি ধরি
খাজা মণ্ডা মনোহরা দিলেন ভাণ্ড ভরি॥
মিশ্রিসাঁচ চিনির ফেনি ক্ষীর তক্তি সরে
চিনির ফেনা এলাচদানা মুক্তা থরে থরে।
ভাঙের লাড়ু সিদ্ধি ব'লে পঞ্চমুখে দিলেন।
ভাণ্ড ভরি গিরিরাজ তখনি সে নিলেন॥

কিন্তু দৌত্যকার্যে যেরূপ নিপুণতা থাকা আবশ্যক হিমালয়ের নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। কৈলাসে কন্যার সহিত অনর্থক বচসা করিয়া তাঁহার বিপুল স্থূল প্রকৃতির পরিচয় দিলেন। দোষের মধ্যে অভিমানিনী তাঁকে বলিয়াছিলেন—

কহ বাবা নিশ্চয়, আর কব পাছে—
সত্য করি বলো আমার মা কেমন আছে।
তুমি নিঠুর হয়ে কুঠুর মনে পাসরিলা ঝি,
শিবনিন্দা করছ কত তার বলব কী॥

সত্য দোষারোপে ভালোমত উত্তর জোগায় না বলিয়া রাগ বেশি হয়। গিরিরাজ সুযোগ পাইলে শিবনিন্দা করিতে ছাড়েন না; এ কথার প্রতিবাদ করিতে না পারিয়া রুষ্ট হইয়া বলিয়া উঠিলেন—

মা, তুমি বল নিঠুর কুঠুর, শম্ভু বলেন শিলা।
ছার মেনকার বুদ্ধি শুনে তোমায় নিতে এলাম॥
তথন শুনে কথা জগৎমাতা কাঁদিয়া অস্থির।
পাটা মেঘের বৃষ্টি যেন প'ল এক রীত॥
নয়নজলে ভেসে চলে, আকুল হল নন্দী—
কৈলাসেতে মিলল ঝরা, হল একটি নদী॥
কেঁদো না মা, কেঁদো না মা, ত্রিপুরসুন্দরী।
কাল তোমাকে নিয়ে যাব পাষাণের পুরী॥
সন্দেশ দিয়েছিলেন মেনকারানী, দিলেন দুর্গার হাতে।
তুষ্ট হয়ে নারায়ণী ক্ষান্ত পেলেন তাতে॥
উমা কন শুন বাবা, বোসো পুনর্বার।
জলপান করিতে দিলেন নানা উপহার॥
যত্ন করি মহেশ্বরী রান্ধন করিলা।
শ্বশুর জামাতা দোঁহে ভোজন করিলা॥

ছড়া যাহাদের জন্য রচিত তাহারা যদি আজ পর্যন্ত ইহার ছন্দোবন্ধ ও মিলের বিরুদ্ধে কোনো আপত্তি না করিয়া থাকে তবে আমাদের বলিবার কোনো কথাই নাই; কিন্তু জামাতৃগৃহে সমাগত পিতার সহিত কন্যার মান-অভিমান ও তাহার শান্তি ও পরে আহার-অভ্যর্থনা এই গৃহচিত্র যেন প্রত্যক্ষের মতো দেখা যাইতেছে। নন্দীটা এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, সে মাঝে হইতে আকুল হইয়া গেল। শ্বশুর জামাতা ভোজনে বসিয়াছেন এবং গৌরী স্বহস্তে রন্ধন করিয়া উভয়কে পরিবেশন করিতেছেন, এ চিত্র মনে গাঁথা হইয়া রহিল।

শয়নকালে দুর্গা বলে আজ্ঞা দেহ স্বামী।
ইচ্ছা হয় যে বাপের বাড়ি কাল যাইব আমি॥

শুন গৌরী, কৈলাসপুরী তুচ্ছ তোমার ঠাঁই।
দেখছি তোমার কাঙাল পিতার ঘর-দরজা নাই॥

শেষ দুইটি ছত্র বুঝিতে একটু গোল হয়। ইহার অর্থ এই যে, তোমার বাসের পক্ষে কৈলাসপুরীই তুচ্ছ, এমন স্থলে তোমার কাঙাল পিতা তোমাকে স্থান দিতে পারেন এমন সাধ্য তাঁহার কী আছে!

পতিকে লইয়া পিতার সহিত বিরোধ করিতে হয়, আবার পিতাকে লইয়া পতির সহিত বিবাদ বাধিয়া উঠে— উমার এমনি অবস্থা।

গৌরী কন, আমি কইলে মিছে দন্দেজ হবে।
সেই-যে আমার কাঙাল পিতা ভিক্ষা মাঙছেন কবে॥
তারা রাজার বেটা, দালান-কোঠা অট্টালিকাময়।
যাগযজ্ঞ করছে কত, শ্মশানবাসী নয়॥
তারা নানা দানপুণ্যবান দেবকার্য করে।
এক দফাতে কাঙাল বটে, ভাঙ নাই তার ঘরে॥

কিন্তু কড়া জবাব দিয়া কার্যোদ্ধার হয় না। বরং তর্কে পরাস্ত হইলে গায়ের জোর আরো বাড়িয়া উঠে। সেই বুঝিয়া দুর্গা তখন—

গুটি পাঁচ-ছয় সিদ্ধির লাড়ু যত্ন ক'রে দিলেন।

দাম্পত্যযুদ্ধে এই ছয়টি সিদ্ধির লাড়ু কামানের ছয়টা গোলার মতো কাজ করিল; ভোলানাথ এক দমে পরাভূত হইয়া গেলেন। সহসা পিতা কন্যা ও জামাতার ঘনিষ্ঠ মিলন হইয়া গেল। বাক্যহীন নন্দী সকৌতুক ভক্তিভরে দ্বারপাশে দাঁড়াইয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল।

সম্ভ্রমে সম্ভাষণ করি বসলেন তিন জন।
দুর্গা, মর্তে যেয়ে কী আনিবে আমার কারণ॥
প্রতিবারে কেবলমাত্র বিল্বপত্র পাই।
দেবী বললেন, প্রভু ছাড়া কোন্ দ্রব্য খাই॥

সিঁদুর-ফোঁটা অলকছটা মুক্তা গাঁথা কেশে।
সোনার ঝাঁপা কনকচাঁপা শিব ভুলেছেন যে বেশে॥
রত্নহার গলে তার দুলছে সোনার পাটা।
চাঁদনি রাত্রিতে যেন বিদ্যুৎ দিচ্ছে ছটা॥
তাড় কঙ্কণ সোন্ পৈঁছি শঙ্খ বাহুমূলে।
বাঁক-পরা মল সোনার নূপুর, আঁচল হেলে দোলে॥
সিংহাসন, পট্টবসন পরছে ভগবতী।
কার্তিক গণেশ চললেন লক্ষ্মী সরস্বতী॥
জয়া বিজয়া দাসী চললেন দুই জন।
গুপ্তভাবে চল্‌লেন শেষে দেব পঞ্চানন॥
গিরিসঙ্গে পরম রঙ্গে চললেন পরম সুখে।
ষষ্ঠী তিথিৎ উপনীত হলেন মর্তলোকে॥
সারি সারি ঘট বারি আর গঙ্গাজল।
সাবধানে নিজ মনে গাচ্ছেন মঙ্গল॥

তখন—

গিরিরানী কন বাণী চুমো দিয়ে মুখে,
কও তারিণী, জামাই-ঘরে ছিলে কেমন সুখে॥

এই ছড়াটি এইখানে শেষ হইল—ইহার বেশি আর বলিবার কথা নাই। এ দিকে বিদায়ের কাল সমাগত। কন্যাকে লইয়া শ্বশুরঘরের সহিত বাপের ঘরের একটু ঈর্ষার ভাব থাকে। বেশিদিন বধূকে বাপের বাড়িতে রাখা শ্বশুরপক্ষের মনঃপূত নহে। বহুকাল পরে মাতায় কন্যায় যথেষ্ট পরিতৃপ্তিপূর্বক মিলন হইতে-না-হইতেই শ্বশুরবাড়ি হইতে তাগিদ আসে, ধন্না বসিয়া যায়। স্ত্রীবিচ্ছেদবিধুর স্বামীর অধৈর্য তাহার কারণ নহে। হাজার হউক বধূ পরের ঘর হইতে আসে; শ্বশুরঘরের সহিত তাহার সম্পূর্ণ জোড় লাগা বিশেষ

চেষ্টার কাজ। সেখানকার নূতন কর্তব্য অভ্যাস ও পরিচয় -বন্ধন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার বাল্যকালের স্বাভাবিক আশ্রয়স্থলে ঘন ঘন যাতায়াত বা দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে দিলে জোড় লাগিবার ব্যাঘাত করে। বিশেষত বাপের বাড়িতে বিবাহিতা কন্যার কেবলই কর্তব্যহীন আদর, শ্বশুরবাড়িতে তাহার কর্তব্যের শাসন, এমন অবস্থায় দীর্ঘকাল বাপের বাড়ির আবহাওয়া শ্বশুরবর্গ বধূর পক্ষে প্রার্থনীয় জ্ঞান করেন না। এই-সকল নানা কারণে পিতৃগৃহে কন্যার গতিবিধি সম্বন্ধে শ্বশুরপক্ষীয়ের বিধান কিছু কঠোর হইয়াই থাকে। কন্যাপিতৃত্বের সেও একটা কষ্ট। বিজয়ার দিন বাংলাদেশের শ্বশুর-বাড়ির সেই কড়া তাগিদ লইয়া শিব মেনকার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। মাতৃ-স্নেহের স্বাভাবিক অধিকার সমাজ-শাসনের বিরুদ্ধে বৃথা আছাড় খাইয়া মরিতে লাগিল।

নাহি আজ গিরিরাজ, শিবকে বলো যেয়ে।
অমনি ভাবে ফিরে যাক সে, থাকবে আমার মেয়ে॥

তখন, শ্বশুরবাড়িতে দুর্গার যত-কিছু দুঃখ আছে সমস্ত মাতার মনে পড়িতে লাগিল। শিবের ভাণ্ডারে যত অভাব, আচরণে যত ত্রুটি, চরিত্রে যত দোষ, সমস্ত তাঁহার নিকট জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। অপাত্রে কন্যাদান করিয়াছেন, এখন সেটা যতটা পারেন সংশোধন করিবার ইচ্ছা, যতটা সম্ভব গৌরীকে মাতৃক্রোড়ে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা। শ্বশুরগৃহের আচারবিচার অনেক সময় দূর হইতে পিতৃ-গৃহের নিকট অযথা বলিয়া মনে হয় এবং পিতৃপক্ষীয়েরা স্নেহের আক্ষেপে কন্যার সমক্ষেই তাহার কঠোর সমালোচনা করিয়া থাকেন। মেনকা তাহাই শুরু করিলেন, এবং শিব সেই অন্যায় আচরণে ক্ষিপ্ত হইয়া শ্বশুরবাড়ির অনুশাসন সতেজে প্রচার করিয়া দিলেন—

মর্তে আসি পূর্বকথা ভুলছ দেখি মনে।
বারে বারে নিষেধ তোমায় করছি এ কারণে॥

মায়ের কোলে মত্ত হয়ে ভুলছ দেখি স্বামী।
তোমার পিতা কেমন রাজা তাই দেখব আমি॥
শুনে কথা গিরিরাজা উদ্যোযুক্ত হল।
জয়-জোগাড়ে অভয়ারে যাত্রা করে দিল॥
যে নিবে সে ক'তে পারে, নইলে এমন শক্তি কার।
যাও তারিণী হরের ঘরে, এসো পুনর্বার॥

অনুগ্রহের সংকীর্ণ মেয়াদ উত্তীর্ণ হইল, কন্যা পতিগৃহে ফিরিয়া গেল।

এক্ষণে যে ছড়ার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি তাহাতে দেবদেবীর একটি গোপন ঘরের কথা বর্ণিত আছে—

শিবসঙ্গে রসরঙ্গে বসিয়ে ভবানী।
কুতূহলে উমা বলেন ত্রিশূলশূলপাণি,
তুমি প্রভু তুমি প্রভু ত্রৈলোক্যের সার—
ইন্দ্র চন্দ্র কুবের বরুণ তোমারি কিংকর॥
তোমার নারী হয়ে আমার সাধ নাহি পোরে।
যেন বেন্যা পতির কপালে প'ড়ে রমণী ঝোরে॥
দিব্য সোনার অলংকার না পরিলাম গায়।
শামের বরন দুই শঙ্খ পরতে সাধ যায়॥
দেবের কাছে মরি লাজে হাত বাড়াতে নারি।
বারেক মোরে দাও শঙ্খ তোমার ঘরে পরি॥

ভোলানাথ ভাবিলেন, একটা কৌতুক করা যাক। প্রথমেই একটু কোন্দল বাধাইয়া তুলিলেন—

ভেবে ভোলা হেসে কন শুন হে পার্বতী,
আমি তো কড়ার ভিখারি ত্রিপুরারি শঙ্খ পাব কথি॥
হাতের শিঙাটা বেচলা পরে হবে না

একখানা শঙ্খের কড়ি,
বলদটা মূল করিলে হবে কাহনটেক কড়ি ॥
এটি ওটি ঠাক ঠিকাটি চাও হে গৌরী,
থাকলে দিতে পারি।
তোমার পিতা আছে বটে অর্থের অধিকারী ।।
সে কি দিতে পারে না দুমুটো শঙ্খের মুজুরি ॥

এই-যে ধনহীনতার ভড়ং এটা মহাদেবের নিতান্ত বাড়াবাড়ি, স্ত্রীজাতির নিকট ইহা স্বভাবতই অসহ্য। স্ত্রী যখন ব্রেস্‌লেট প্রার্থনা করে কেরানিবাবু তখন আয়ব্যয়ের সুদীর্ঘ হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া আপন দারিদ্র্য প্রমাণ করিতে বসিলে কোন্ ধর্মপত্নী তাহা অবিচলিত রসনায় সহ্য করিতে পারে? বিশেষত শিবের দারিদ্র্য ওটা নিতান্তই পোশাকি দারিদ্র্য; তাহা কেবল ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ সকলের উপরে টেক্কা দিবার জন্য, কেবল লক্ষ্মীর জননী অন্নপূর্ণার সহিত একটা অপরূপ কৌতুক করিবার অভিপ্রায়ে। কালিদাস শংকরের অট্টহাস্যকে কৈলাসশিখরের ভীষণ তুহিনপুঞ্জের সহিত তুলনা করিয়াছেন; মহেশ্বরের শুভ্রদারিদ্র্যও তাঁহার এক নিঃশব্দ অট্টহাস্য। কিন্তু দেবতার পক্ষেও কৌতুকের একটা সীমা আছে। মহাদেবী এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাব যেরূপে ব্যক্ত করিলেন তাহা অত্যন্ত স্পষ্ট। তাহাতে কোনো কথাই ইঙ্গিতের অপেক্ষায় রহিল না।

গৌরী গর্জিয়ে কন, ঠাকুর শিবাই
আমি গৌরী তোমার হাতে শঙ্খ পরতে চাই।
আপনি যেমন যুব্‌-যুবতী অমনি যুবক পতি হয়
তবে সে বৈরস রস নইলে কিছুই নয় ॥
আপনি বুড়ো আধবয়সী ভাঙধুতুরায় মত্ত।
আপনার মতো পরকে বলে মন্দ ॥

এইখানে শেষ হয় নাই—ইহার পরে দেবী মনের ক্ষোভে আরো দুই-চারিটি যে কথা বলিয়াছেন তাহা মহাদেবের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে; তাহা সাধারণ্যে প্রকাশযোগ্য নহে। সুতরাং আমরা উদ্‌ধৃত করিতে ক্ষান্ত হইলাম। ব্যাপারটা কেবল এইখানেই শেষ হইল না; স্ত্রীর রাগ যতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, অর্থাৎ বাপের বাড়ি পর্যন্ত, তাহা গেল।

কোলে করি কার্তিক হাঁটায়ে লম্বোদরে
ক্রোধ করি হরের গৌরী গেলা বাপের ঘরে॥

এ দিকে শিব তাঁহার সংকল্পিত দাম্পত্যপ্রহসনের নেপথ্যবিধান শুরু করিলেন।

বিশ্বকর্মা এনে করান শঙ্খের গঠন।

শঙ্খ লইয়া শাঁখারি সাজিয়া বাহির হইলেন—

দুই বাহু শঙ্খ নিলেন নাম শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
কপটভাবে হিমালয়ে তলাসে ফেরেন॥
হাতে শূলী কাঁথে থলি শম্ভু ফেরে গলি গলি।
শঙ্খ নিবি শঙ্খ নিবি এই কথাটি ব'লে॥
সখীসঙ্গে বসে গৌরী আছে কুতূহলে।
শঙ্খ দেখি শঙ্খ দেখি এই কথাটি বলে॥
গৌরীকে দেখায়ে শাঁখারি শঙ্খ বার ক'ল্ল।
শঙ্খের উপরে যেন চন্দ্র উদয় হল॥
মনি-মুকুতা-প্রবাল-গাঁথা মাণিক্যের ঝুরি।
নব ঝলকে ঝলকে যেন ইন্দ্রের বিজুলি॥

দেবী খুশি হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

শাঁখারি ভালো এনেছ শঙ্খ।
শঙ্খের কত নিবে তঙ্ক॥

দেবীর লুব্ধভাব দেখিয়া চতুর শাঁখারি প্রথমে দর-দামের কথা কিছুই আলোচনা করিল না; কহিল—

গৌরী, ব্রহ্মলোক, বৈকুণ্ঠ, হরের কৈলাস, এ তো সবাই কয়।
বুঝে দিলেই হয়।
হস্ত ধুয়ে পরো শঙ্খ, দেরি উচিত নয়॥

শাঁখারি মুখে মুখে হরের স্থাবর সম্পত্তির যেরূপ ফর্দ দিল তাহাতে শাঁখাজোড়া যে বিশেষ সস্তায় যাইবে মহাদেবীর এমন মনে করা উচিত ছিল না।

গৌরী আর মহাদেবে কথা হল দড়।
সকল সখি বলে দুর্গা শঙ্খ চেয়ে পরো।
কেউ দিলেন তেল গামছা কেউ জলের বাটি।
দেবের উরুতে হস্ত থুয়ে বসলেন পার্বতী॥
দয়াল শিব বলেন, শঙ্খ আমার কথাটি ধরো।
দুর্গার হাতে গিয়ে শঙ্খ বজ্র হয়ে থাকো॥
শিলে নাহি ভেঙো শঙ্খ খড়্গে নাহি ভাঙো।
দুর্গার সহিত করেন বাক্যের তরঙ্গ॥
এ কথা শুনিয়া মাতা মনে মনে হাসে।
শঙ্খ পরান জগৎপিতা মনের হরষে॥
শাঁখারি ভালো দিলে শঙ্খ মানায়ে।
ভাণ্ডার ভেঙে দেইগে তঙ্ক লওগে গনিয়ে॥

এতক্ষণে শাঁখারি সময় বুঝিয়া কহিল—

আমি যদি তোমার শঙ্খের লব তঙ্ক
জ্ঞেয়াত-মাঝারে মোর রহিবে কলঙ্ক॥

ইহারা যে বংশের শাঁখারি তাঁহাদের কুলাচার স্বতন্ত্র; তাঁহাদের বিষয়বুদ্ধি কিছুমাত্র নাই; টাকাকড়ি সম্বন্ধে বড়ো নিস্পৃহ; ইহারা যাঁহাকে শাঁখা পরান

তাঁহাকে পাইলেই মূল্যের আর কোনো প্রকার দাবি রাখেন না! ব্যবসায়টি অতি উত্তম।

কেমন কথা কও শাঁখারি কেমন কথা কও।
মানুষ বুঝিয়া শাঁখারি এসব কথা কও ॥

শাঁখারি কহিল—

না করো বড়াই দুর্গা না করো বড়াই।
সকল তত্ত্ব জানি আমি এই বালকের ঠাঁই ॥
তোমার পতি ভাঙড় শিব তা তো আমি জানি।
নিতি নিতি প্রতি ঘরে ভিক্ষা মাঙেন তিনি ॥
ভস্মমাখা তায় ভুজঙ্গ মাথে অঙ্গে।
নিরবধি ফেরেন তিনি ভূত-পেরেতের সঙ্গে।

ইহাকেই বলে শোধ তোলা। নিজের সম্বন্ধে যে-সকল স্পষ্ট ভাষা মহাদেব সহধর্মিণীর মুখ হইতে মধ্যে মধ্যে শুনিয়া আসিয়াছেন; অদ্য সুযোগমত সেই সত্য কথাগুলিই গৌরীর কানে তুলিলেন।

এই কথা শুনি মায়ের রোদন বিপরীত।
বাহির করতে চান শঙ্খ না হয় বাহির ॥
পাষাণ আনিল চণ্ডী শঙ্খ না ভাঙিল।
শঙ্খেতে ঠেকিয়া পাষাণ খণ্ড খণ্ড হল ॥
কোনোরূপে শঙ্খ যখন না হয় কর্তন।
খড়্গ দিয়ে হাত কাটিতে দেবীর গেল মন ॥
হস্ত কাটিলে শঙ্খে ভরিবে রুধিরে।
রুধির লাগিলে শঙ্খ নাহি লব ফিরে ॥
মেনকা গো মা,
কী কুক্ষণে বাড়াছিলাম পা ॥

মরিব মরিব মা গো হব আত্মঘাতী।
আপনার গলে দিব নরসিংহ কাতি ॥

অবশেষে অন্য উপায় না দেখিয়া দুর্গা ধূপ দীপ নৈবেদ্য লইয়া ধ্যানে বসিলেন—

ধ্যানে পেলেন মহাদেবের চরণ-দুখান।

তখন ব্যাপারটা বুঝা গেল ; দেবতার কৌতুকের পরিসমাপ্তি হইল।

কোথা বা কন্যা, কোথা বা জামাতা।
সকলেই দেখি যেন আপন দেবতা ॥

এ যেন ঠিক স্বপ্নের মতো হইল। নিমেষের মধ্যে—

দুর্গা গেলেন কৈলাসে, শিব গেলেন শ্মশানে।
ভাঙ ধুতুরা বেঁটে দুর্গা বসলেন আসনে।
সন্ধ্যা হলে দুই জনে হলেন একখানে ॥

এইখানে চতুর্থ ছত্রের অপেক্ষা না রাখিয়াই ছড়া শেষ হইয়া গেল।

রাধাকৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় ছড়াগুলির জাতি স্বতন্ত্র। সেখানে বাস্তবিকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। প্রাত্যহিক ঘটনা, সাংসারিক ব্যাপার, সামাজিক রহস্য সেখানে স্থান পায় না। সেই অপরূপ রাখালের রাজ্য বাঙালি ছড়া-রচয়িতা ও শ্রোতাদের মানসরাজ্য।

স্থানে স্থানে ফেরেন রাখাল, সঙ্গে কেহ নাই।
ভাণ্ডীবনে ধেনু চরান সুবল কানাই ॥
সুবল বলিছে শুন ভাই রে কানাই।
আজি তোরে ভাণ্ডীবনবিহারী সাজাই ॥

এই সাজাইবার প্রস্তাব মাত্র শুনিয়া নিকুঞ্জে যেখানে যত ফুল ছিল সকলেই আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিল—

কদম্বের পুষ্প বলেন সভা-বিদ্যমানে
সাজিয়া তুলিব আজি গোবিন্দের কানে॥
করবীর পুষ্প বলেন, আমার মর্ম কে বা জানে—
আজ আমায় রাখবেন হরি চূড়ার সাজনে॥
অলক-ফুলের কনক দাম বেলফুলের গাঁথনি—
আমার হৃদয়ে শ্যাম দুলাবে চূড়ামণি॥
আনন্দেতে পদ্ম বলেন, তোমরা নানা ফুল
আমায় দেখলে হবে চিত্ত ব্যাকুল॥
চরণতলে থাকি আমি কমল পদ্ম নাম
রাধাকৃষ্ণে একাসনে হেরিব বয়ান॥

কোনো ফুলকেই নিরাশ হইতে হইল না; সেদিন তাহাদের ফুটিয়া ওঠা সার্থক হইল—

ফুলেরই উড়ানি ফুলেরই জামাজুরি
সুবল সাজাইলি ভালো।
ফুলেরই পাগ ফুলেরই পোশাক
সেজেছে বিহারীলাল।
নানা আভরণ ফুলেরই ভূষণ
চূড়াতে করবী ফুল।
কপালে কিরীটি অতি পরিপাটি
পড়েছে চাঁচর চুল।

এ দিকে কৌতূহলী ভ্রমর-ভ্রমরী ময়ূর-ময়ূরী খঞ্জন-খঞ্জনীর মেলা বসিয়া গেল। যে-সকল পাখির কণ্ঠ আছে তাহারা সুবলের কলানৈপুণ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। কোকিল সস্ত্রীক আসিয়া বলিয়া গেল 'কিংকিণী কিরীটি অতি পরিপাটি'—

ডাহুক ডাহুকী টিয়া টুয়া পাখি
ঝংকারে উড়িয়া যায়।

তাহারা ঝংকার করিয়া কী কথা বলিল ?

স্থবল রাখাল সাজায়েছে ভালো
বিনোদবিহারীরায়।

এ দিকে চাতক-চাতকী শ্যামকে মেঘ ভ্রম করিয়া উড়িয়া উড়িয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া 'জল দে' 'জল দে' বলিয়া ডাকিয়া বেড়াইতে লাগিল। বনের মধ্যে শাখায় পল্লবে বাতাসে আকাশে ভারি একটা রব পড়িয়া গেল।

কানাই বলিছে প্রাণের ভাই রে স্থবল
কেমনে সাজালে ভাই বল্ দেখি বল্।

কানাই জানেন তাঁহার সাজ সম্পূর্ণ হয় নাই। কোকিল-কোকিলা আর ডাহুক-ডাহুকীরা যাহাই বলুক-না কেন, স্থবলের রুচি এবং নৈপুণ্যের প্রশংসা করিবার সময় হয় নাই।

নানা ফুলে সাজালে ভাই, বামে দাও প্যারী।
তবে তো সাজিবে তোর বিনোদবিহারী।

বৃন্দাবনের সর্বপ্রধান ফুলটিই বাকি ছিল। সেই অভাবটা পশু-পক্ষীদের নজরে না পড়িতে পারে, কিন্তু শ্যামকে যেন বাজিতে লাগিল।

কুঞ্জ-পানে যে দিকে ভাই চেয়ে দেখি আঁখি।
স্থখময় কুঞ্জবন অন্ধকার দেখি॥

তখন লজ্জিত স্থবল কহিল—

এই স্থানে থাকো তুমি নবীন বংশীধারী।
খুঁজিয়া মিলাব আজ কঠিন কিশোরী॥

এ দিকে ললিতা-বিশাখা সখীদের মাঝখানে রাধিকা বসিয়া আছেন।

৮

সুবলকে দেখিয়া সবাই হয়ে হরষিত—
এসো এসো বোসো সুবল একী অচরিত ॥

সুবল সংবাদ দিল—

মন্দ মন্দ বহিতেছে বসন্তের বা, পত্র পড়ে গলি।
কাঁদিয়া বলেন কৃষ্ণ কোথায় কিশোরী ॥

কৃষ্ণের দুরবস্থার কথা শুনিয়া রাধা কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন—

সাধ ক'রে হার গেঁথেছি সই,
দিব কার গলে।
ঝাঁপ দিয়ে মরিব আজ যমুনার জলে ॥

রাই অনাবশ্যক এইরূপ একটা দুঃসাধ্য দুঃসাহসিক ব্যাপার ঘটাইবার জন্য মুহূর্তের মধ্যে কৃতসংকল্প হইয়া উঠিলেন। কিন্তু অবশেষে সখীদের সহিত রফা করিয়া বলিলেন—

যেই সাজে আছি আমি এই বৃন্দাবনে
সেই সাজে যাব আমি কৃষ্ণদরশনে ॥
দাঁড়া লো দাঁড়া লো সই বলে সহচরী।
ধীরে যাও ফিরে চাও রাধিকাসুন্দরী ॥

রাধিকা সখীদের ডাকিয়া বলিলেন—

তোমরা গো পিছে এসো মাথে করে দই।
নাথের কুশল হোক, ঝটিৎ এসো সই ॥

রাধা প্রথম আবেগে যদিও বলিয়াছিলেন, যে সাজে আছেন সেই সাজেই যাইবেন, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রহিল না।

হালিয়া মাথায় বেণী বামে বাঁধি চূড়া
অলকা তিলকা দিয়ে এঁটে পরে ধড়া।
ধড়ার উপর তুলে নিলেন সুবর্ণের ঝরা ॥

সোনার বিজটা শোভে হাতে তাড়বালা।
গলে শোভে পঞ্চরত্ন তক্তি কণ্ঠমালা॥
চরণে শোভিছে রাইয়ের সোনার নূপুর।
কটিতে কিংকিণী সাজে, বাজিছে মধুর॥
চিন্তা নাই চিন্তা নাই বিশাখা এসে বলে।
ধবলীর বৎস একটি তুলে লও কোলে॥

সখীরা সব দধির ভাণ্ড মাথায় এবং রাধিকা ধবলীর এক বাছুর কোলে লইয়া গোয়ালিনীর দল ব্রজের পথ দিয়া শ্যাম-দরশনে চলিল। কৃষ্ণ তখন রাধিকার রূপ ধ্যান করিতে করিতে অচেতন।

সাক্ষাতে দাঁড়ায়ে রাই বলিতেছে বাণী—
কী ভাব পড়িছে মনে শ্যাম গুণমণি।
যে ভাব পড়েছে মনে সেই ভাব আমি॥

রাধিকা সগর্বে সবিনয়ে কহিলেন, তোমারই অন্তরের ভাব আমি বাহিরে প্রত্যক্ষ বিরাজমান।

গাও তোলো চক্ষু মেলো ওহে নীলমণি।
কাঁদিয়ে কাঁদাও কেন, আমি বিনোদিনী॥
অঞ্চলেতে ছিল মালা দিল কৃষ্ণের গলে।
রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন ভাণ্ডীরবনে॥

ভাণ্ডীরবনবিহারীর সাজ সম্পূর্ণ হইল ; সুবলের হাতের কাজ সমাধা হইয়া গেল।

ইহার মধ্যে বিশেষ করিয়া বাংলার গ্রাম্যদৃশ্য গৃহচিত্র কিছুই নাই। গোয়ালিনীরা যেরূপ সাজে নূপুর কিংকিণী বাজাইয়া, দধি মাথায়, বাছুর কোলে বনপথ দিয়া চলিয়াছেন, তাহা বাংলার গ্রামপথে প্রত্যহ অথবা কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাখালেরা মাঠের মধ্যে বটচ্ছায়ায় অনেকরকম খেলা করে, কিন্তু ফুল লইয়া তাহাদের ও তাহাদিগকে লইয়া ফুলের এমন মাতামাতি শুনা

যায় না। এ-সমস্ত ভাবের সৃষ্টি। কৃষ্ণরাধার বিরহ-মিলন সমস্ত বিশ্ববাসীর বিরহ-মিলনের আদর্শ; ইহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণসমাজ বা মনুসংহিতা নাই; ইহার আগাগোড়া রাখালি কাণ্ড। যেখানে সমাজ বলবান সেখানে বৃন্দাবনের গোচারণের সঙ্গে মথুরার রাজ্যপালনের একাকার হওয়া অত্যন্ত অসংগত। কিন্তু কৃষ্ণরাধার কাহিনী যে ভাবলোকে বিরাজ করিতেছে সেখানে ইহার কোনো কৈফিয়ৎ আবশ্যক করে না। এমন-কি, সেখানে চিরপ্রচলিত সমস্ত সমাজপ্রথাকে অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবনের রাখালবৃত্তি মথুরার রাজত্ব অপেক্ষা অধিকতর গৌরবজনক বলিয়া সপ্রমাণ হইয়াছে। আমাদের দেশে, যেখানে কর্মবিভাগ শাস্ত্রশাসন এবং সামাজিক উচ্চনীচতার ভাব সাধারণের মনে এমন দৃঢ় বদ্ধমূল, সেখানে কৃষ্ণরাধার কাহিনীতে এই-প্রকার আচারবিরুদ্ধ বন্ধনবিহীন ভাবের স্বাধীনতা যে কত বিস্ময়কর তাহা চিরাভ্যাসক্রমে আমরা অনুভব করি না।

কৃষ্ণ মথুরায় রাজত্ব করিতে গেলে রাধিকা কাঁদিয়া কহিলেন—

আর কি এমন ভাগ্য হবে, ব্রজে আসবে হরি।
সে গিছে মথুরাপুরী, মিথ্যে আশা করি॥

রাজাকে পুনরায় রাখাল করিবার আশা দুরাশা, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু, বৃন্দা বৃন্দাবনের আসল কথা বোঝে, সে জানে নিরাশ হইবার কোনো কারণ নাই। সে জানে, বৃন্দাবন-মথুরায় কাশী-কাঞ্চীর নিয়ম ঠিক খাটে না।

বৃন্দে বলে আমি যদি এনে দিতে পারি
তবে মোরে কী ধন দিবে
বল তো কিশোরী॥
শুনে বাণী কমলিনী যেন পড়িল ধন্দে—
দেহপ্রাণ করেছে দান কৃষ্ণপদারবিন্দে॥

এক কালেতে যাঁক সঁপেছি বিরাগ হলেন তাঁই।
যম-সম কোনো দেবতা রাধিকার নাই॥
ইহা বই নিশ্চয় কই কোথা পাব ধন।
মোর কেবল কৃষ্ণনাম অঙ্গের ভূষণ॥
রাজার নন্দিনী মোরা প্রেমের ভিখারি—
বঁধুর কাছে সেই ধন লয়ে দিতে পারি॥
বলছে দূতী, শোন্ শ্রীমতী, মিলবে শ্যামের সাথে।
তখন দুজনের দুই যুগল চরণ, তাই দিয়ো মোর মাথে॥

এই পুরস্কারের কড়ার করাইয়া লইয়া দূতী বাহির হইলেন। যমুনা পার হইয়া পথের মধ্যে—

হাস্যরসে একজনকে জিজ্ঞাসিলেন তবে,
কও দেখি কার অধিকারে বসত কর সবে॥
সে লোক বললে তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্ররায়,
মেঘের ধারা রৌদ্রে যেমন লাগল দূতীর গায়॥
ননীচোরা রাখাল ছোঁড়া ঠাট করেছে আসি।
চোর বিনে তাকে কবে ডাকছে গোকুলবাসী॥

কৃষ্ণের এই রায়বাহাদুর খেতাবটি দূতীর কাছে অত্যন্ত কৌতুকাবহ বোধ হইল। কৃষ্ণচন্দ্ররায়, এ তো আসল নাম নয়। এ কেবল মূঢ় লোকদিগকে ভুলাইবার একটা আড়ম্বর। আসল নাম বৃন্দা জানে।

চললেন শেষে কাঙালবেশে উতরিলেন দ্বারে।
হুকুম বিনে রাত্রিদিনে কেউ না যেতে পারে॥

বহুকষ্টে হুকুম আনাইয়া 'বৃন্দাদূতী গেল সভার মাঝে'।

সম্ভাষণ করি দূতী থাকল কতক্ষণ।
একদৃষ্টে চেয়ে দেখে কৃষ্ণের বদন॥

ধড়াচূড়া ত্যাগ করিয়ে মুকুট দিয়েছ মাথে।
সব অঙ্গে রাজ-আভরণ, বংশী নাইকো হাতে॥
সোনার মালা, কণ্ঠহার, বাহুতে বাজুবন্ধ।
শ্বেত চামরে বাতাস পড়ে দেখে লাগে ধন্দ॥
নিশান উড়ে, ডঙ্কা মারে, বলছে খবরদার।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘটা ব্যবস্থা বিচার॥
আর এক দরখাস্ত করি শুন দামোদর।
যমুনাতে দেখে এলেম এক তরী মনোহর॥
শূন্য হয়ে ভাসছে তরী ওই যমুনা-তীরে।
কাণ্ডারী অভাবে নৌকা ঘাটে ঘাটে ফিরে॥
পূর্বে এক কাণ্ডারী ছিল সর্বলোকে কয়।
সে চোর পালালো কোথা তাকে ধরতে হয়॥
শুনতে পেলেম হেথা এলেম মথুরাতে আছে।
হাজির না কর যদি জানতে পাবে পাছে॥
—মেয়ে হয়ে কয় কথা, পুরুষের ডরায় গা।
সভাসুদ্ধ নিঃশব্দ, কেউ না করে রা॥—
ব্রজপুরে ঘর বসতি মোর।
ভাণ্ড ভেঙে ননি খেয়ে পলায়েছে চোর॥
চোর ধরিতে এই সভাতে আসছে অভাগিনী।
কেমন রাজা বিচার কর জানব তা এখনি॥

বৃন্দা কৃষ্ণচন্দ্ররায়ের রাজসম্মান রক্ষা করিয়া ঠিক দস্তুর-মত কথাগুলি বলিল—অন্তত কবির রিপোর্ট দৃষ্টে তাহাই বোধ হয়—তবে উহার মধ্যে কিছু স্পর্ধাও ছিল। বৃন্দা মথুরার উপরে আপন বৃন্দাবনের দেমাক ফলাইতে ছাড়ে নাই। 'হাজির না কর যদি জানতে পাবে পাছে' এ কথাটা খুব চড়া কথা;

শুনিয়া সভাস্থ সকলে নিঃশব্দ হইয়া গেল। মথুরার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্ররায় কহিলেন—

ব্রজে ছিলে বৃন্দাদাসী বুঝি অনুমানে।
কোন্‌দিন বা দেখা-সাক্ষাৎ ছিল বৃন্দাবনে॥
তখন বৃন্দা কচ্ছেন, কী জানি তা হবে কদাচিৎ।
বিষয় পেলে অনেক ভোলে মহতের রীত॥

কৃষ্ণ বৃন্দাবনের কুশলসংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে বৃন্দা কহিলেন—

হাতে ননি ডাকছে রানী গোপাল কোথা রয়।
ধেনু বৎস আদি তব তৃণ নাহি খায়॥
শতদল ভাসতেছে সেই সমুদ্র-মাঝে।
কোন্‌ ছার ধুতুরা পেয়ে এত ডঙ্কা বাজে॥

মথুরার রাজত্বকে বৃন্দা ধুতুরার সহিত তুলনা করিল; তাহাতে মত্ততা আছে, কিন্তু বৃন্দাবনের সৌন্দর্য ও সুগন্ধ কোথায়!

বলা বাহুল্য, ইহার পর বৃন্দার দৌত্য ব্যর্থ হয় নাই—

দূতী কৃষ্ণ লয়ে বিদায় হয়ে ব্রজপুরে এল।
পশুপক্ষী আদি যত পরিত্রাণ পেল॥
ব্রজের ধন্য লতা তমালপাতা ধন্য বৃন্দাবন।
ধন্য ধন্য রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন॥

বাংলার গ্রাম্যছড়ায় হরগৌরী এবং রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়া সীতারাম ও রাম-রাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা তুলনায় স্বল্প। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক। আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার প্রসর সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ

মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশের রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই। রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশ-প্রচলিত হরগৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ; তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল। রামায়ণ-কথায় এক দিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপর দিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য, একত্র সম্মিলিত। তাহাতে দাম্পত্য, সৌভ্রাত্র, পিতৃভক্তি, প্রভুভক্তি, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি মনুষ্যের যতপ্রকার উচ্চ অঙ্গের হৃদয়বন্ধন আছে তাহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। তাহাতে সর্বপ্রকার হৃদয়বৃত্তিকে মহৎ ধর্মনিয়মের দ্বারা পদে পদে সংযত করিবার কঠোর শাসন প্রচারিত। সর্বতোভাবে মানুষকে মানুষ করিবার উপযোগী এমন শিক্ষা আর-কোনো দেশে কোনো সাহিত্যে নাই। বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ-কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।

১৩০৫

—

গ্রন্থপরিচয়

মজুমদার লাইব্রেরি -কর্তৃক প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের গদ্যগ্রন্থাবলীর তৃতীয় ভাগ -রূপে লোকসাহিত্য ১৩১৪ সালে প্রথম প্রচারিত হয়।

বর্তমান সংস্করণের দ্বিতীয় প্রবন্ধ— 'ছেলেভুলানো ছড়া : ২' ১৩৪৫ সালে প্রথম গ্রন্থভুক্ত হইয়াছে। সংকলিত নিবন্ধচতুষ্টয়ের সাময়িক পত্রে প্রকাশের সূচী নিম্নে দেওয়া গেল—

ছেলেভুলানো ছড়া[১]	সাধনা। আশ্বিন-কার্তিক ১৩০১
ছেলেভুলানো ছড়া : ২[২]	সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। মাঘ ১৩০১ এবং কার্তিক ১৩০২
কবি-সংগীত[৩]	সাধনা। জ্যৈষ্ঠ ১৩০২
গ্রাম্যসাহিত্য	ভারতী। ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৫

১ 'মেয়েলি ছড়া' নামে মুদ্রিত।

২ ১৩০১ মাঘ সংখ্যায় সম্পাদক রজনীকান্ত গুপ্ত, সংকলিত তিনটি ছড়ার এক-একটি পাঠান্তর পাদটীকায় দেন। (সেগুলি পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।) তাহা ছাড়া, ১৩০২ কার্তিক সংখ্যায় 'বাঁকুড়া-বেলেতোড় হইতে সংগৃহীত' ২৬টি, 'মেদিনীপুর হইতে সংগৃহীত' ৪টি, 'বন-বিষ্ণুপুর হইতে সংগৃহীত' ৮টি এবং 'সাঁওতাল পরগনার ছড়া' ১৬টি রবীন্দ্রনাথের ছড়া-সংগ্রহের পরিপূরক হিসাবে মুদ্রিত হয়। সংগ্রাহকেরা বলেন, এগুলি প্রধানত পাঠান্তর বলিয়াই গণ্য হইবে।

৩ 'গুপ্তরত্নোদ্ধার' নামে মুদ্রিত।
"শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় -কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত" 'গুপ্তরত্নোদ্ধার বা প্রাচীন কবিসঙ্গীতসংগ্রহ' গ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিত।

পাঠান্তর

বর্তমান গ্রন্থের ৫০-৫৩ পৃষ্ঠায় সংকলিত ছড়ার অন্য একটি পাঠান্তর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (মাঘ ১৩০১) সম্পাদক পাদটীকায় দেন—

আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে।
ডাহিন মেড়া ঘাগর বাজে॥
বাজতে বাজতে লাগলো হুলি।
কে কে যাবি কদমফুলি॥
ওন্ গোন্ টিয়ে টোন্।
লাল বাগানের লাল ঝট্কা।
লেগে যা গোয়াল ঘট্কা॥
হলুদ ফুলে কলুদ ফুল।
আয়রে আমার টগরের ফুল॥
কাকী রাঁধে কুকী খায়।
হিম সময়ে দুঃখ পায়॥
বনের বাঘে খায় কী।
কপ্‌লে গায়ের দুধ॥
কপ্‌লে গাই নড়ে চড়ে।
পান ছিট্‌কির বাড়ি মারে॥

সংকলিত প্রথম ছড়ার (পৃ. ৫৩) পাঠান্তর—

মাসি পিসি বনগাঁবাসী বনের আগে টিয়া।
মাসি গেলেন শ্রীবৃন্দাবন দেখে আসি গিয়া॥
কিসের মাসি কিসের পিসি কিসের বৃন্দাবন।
এতদিনে জানলেম আমি মা বড়ো ধন॥
মাকে দেব শঙ্খ সিন্দূর ভাইকে দেব বিয়া।
সোনার মুকুট মাথায় দিয়া তীর্থ করি গিয়া॥

সংকলিত একাদশ ছড়ার (পৃ. ৫৭) পাঠান্তর—

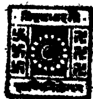
ঘুঘু—ঘু!
পেটে—ফুঁ ॥
কী ছেলে হ'ল।
বেটা ছেলে ॥
ছেলে কই।
মাছ ধরতে গেছে ॥
মাছ কই।
চিলে নিলে ॥
চিল কই।
ডালে বসেছে ॥
ডাল কই।
পুড়েঝুড়ে গেল ॥
ছাই মাটি কই।
ধোপায় নিলে ॥
কী করলে!
কাপড় ধুলে ॥
সোনা কুড়ে পড়বি, না
ছাই কুড়ে পড়বি?।

৬১-৬৪ -সংখ্যক ছড়া (পৃ. ৭১-৭২) কোনো বিক্রমপুরনিবাসী ভদ্রগৃহস্থ হইতে সংগৃহীত।

৪৭-সংখ্যক ছড়ার একটি পাঠান্তর হুগলি-অঞ্চলে এইরূপ শোনা যায়—

কাজল বলে আজল রে ভাই আমি রাঙা মুখের পান।
কালো মুখে গেলে পরে আমি হই গো হতমান ॥

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় -কর্তৃক সংকলিত বঙ্গীয় শব্দকোষ-অনুসারে : আজল='আদরিনী' বা যে আদরে নেকা সাজে।



মূল্য ১৯'০০ টাকা